সাহিত্য-চিন্তা।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু

প্রণীত।

কলিকাতা ; সাহিত্য যন্ত্র।

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩০৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদন।
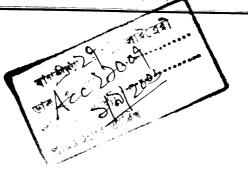
দুই কারণে বিলাতী সাহিত্যের এত গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। প্রথমতঃ, বিলাতী সাহিত্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত ; সেই প্রচারের সহিত তাহার আদরও সর্ব্বত্র। দ্বিতীয়তঃ, বিলাতী সমালোচকগণ স্বদেশীয় সাহিত্যের অশেষ সৌন্দর্য্য বাহির করিয়া সহস্রমুখে তাহাতে গৌরবপাত করিয়াছেন। ফল এই দাঁড়াইয়াছে, পৃথিবীময় বিলাতী সাহিত্য-প্রচারের সহিত, তাহার অভাবনীয় সৌন্দর্য্য এবং গরিমারও প্রচার হইয়াছে। বিলাতী সাহিত্যের যেরূপ সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, আর্য্যসাহিত্যের তাহা ঘটে নাই। আর্য্যসাহিত্যের আলোচনা পৃথিবীতে নাই বলিলেই হয়—স্বদেশে পর্য্যন্ত নাই ; স্বদেশে যাহা কিছু আছে, তাহা গণনার মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং সমালোচনায় তাহার অশেষ সৌন্দর্য্যও প্রস্ফুটিত হয় নাই। আর্য্যসাহিত্য এক্ষণে অধীত হয় না বলিয়া, তাহার আলোচনপ্রভাবে যে রুচি সংগঠিত হইতে পারে, ভারতে সে রুচিরও নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আর্য্য-সাহিত্যের যদি বিস্তৃত আলোচনা হয়, সমালোচকগণ তাহার সৌন্দর্য্যরাশি যে ক্রমে ক্রমে বাহির করিতে থাকিবেন, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভাগ্যে জার্ম্মেনীতে শকুন্তলা অধীত হইয়াছিল, তাই আজি গেটের মুখে তাহার প্রশংসা বুঝি ধরে না। আর্য্যসাহিত্যে যে আর কত সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, কে

বলিতে পারে? আমার চিন্তাস্রোতে যে কতিপয় সৌন্দর্য্য-কুসুম ভাসিয়াছে, আমি তাহাই আহরণ করিয়াছি মাত্র। যাঁহারা বিলাতী সমালোচন-রীতি শিখিয়া সাহিত্যের সৌন্দর্য্য বাহির করিবার শক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভা-সম্পন্ন, তাঁহারা যদি এ ক্ষেত্রে অবতরণ করেন, নিশ্চয় বলিতে পারি, আর্য্যসাহিত্যের সৌন্দর্য্যগরিমা সহস্র বর্ণে দেখা দিবে। আর্য্যকবি-কল্পনার মানসসরোবরে যে কত শত স্বর্ণ-কমল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা কেবল দিব্যকন্যা প্রতিভার চক্ষেই প্রভাসিত হয়। অর্জ্জুনের মত দেবদত্ত দিব্যবল আমার নাই যে, প্রতিভার সেই দিব্যবলে চিন্তাস্রোত অবলম্বন পূর্ব্বক শত শত স্বর্ণকমল সংগ্রহ করিয়া মাতৃভাষার পাদমূলে সমর্পণ করি।

আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য আমি সেই সাহিত্যের সহিত কোন কোন স্থলে বিলাতী সাহিত্যের তুলনা করিয়াছি। তুলনায় এই দুই সাহিত্য পাশাপাশি সংস্থাপিত হওয়াতে উভয়েরই প্রকৃত ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যাহার প্রকৃত ধর্ম্ম বাহির করা যায়, তাহার কি মর্য্যাদাহানি হয়? তা যদি না হয়, তবে বোধ হয়, কোন সাহিত্যেরই আমি মর্য্যাদাহানি করি নাই। সেরূপ করাও আমার অভিপ্রেত নহে। হিন্দু-ভূমিতে দাঁড়াইয়া হিন্দু রুচিতে বিলাতী সাহিত্যের আলোচনা করিলে, তাহার ফল যে বিলাতী-রুচি-সম্পন্ন-সমালোচন-ফল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, এ কথা অনায়াসে অনুমিত হইতে পারে। কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছে। তবে যদি আমার রুচি অহিন্দু হই-থাকে, সে কথা স্বতন্ত্র। তদ্রূপ অহিন্দু রুচিবিকারে আমি য কোন বিলাতী চিত্রে কলঙ্কার্পণ করিয়া থাকি, সহৃদয় জনগণ

দোষ আমার ক্ষমা করিবেন। কারণ, সে দোষ আমার জ্ঞান-গোচর নহে। আমি বুঝিয়াছি, বিলাতী কবি প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিতে যেমন ভালবাসেন, আর্য্যকবি তেমনি প্রকৃতিতে দেবসৌন্দর্য্য দেখিতে ভালবাসেন। একজনের চক্ষে সরোবরে বিকসিতা কমলিনীর কান্তি অতি মনোহরা, অন্যজনের চক্ষে সেখানে শ্রীমন্তের দৃষ্টির ন্যায় "কমলে কামিনী" উদ্ভাসিতা হন। সরোবরে বিকসিতা কমলিনীর এক শোভা, আর লক্ষ্মী বা সরস্বতীর পাদপদ্মে তাহার আর এক শোভা। বিলাতী কবির সৌন্দর্য্য বিলাতী সমালোচকগণ সহস্রমুখে বর্ণন করিয়াছেন; আমার বিষয়ীভূত নহে বলিয়া আমি তাহা দেখাই নাই। আমার যাহা বিষয়ীভূত তন্মাত্র দেখাইবার জন্য, যে পর্য্যন্ত বিলাতী সাহিত্যের সহায়তা আবশ্যক হইয়াছে, আমি সেই সহায়তামাত্রই গ্রহণ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের প্রথম প্রস্তাবত্রয় পূর্ব্বে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধত্রয়ের স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাতে আর দুইটি প্রস্তাব সংযোজিত করিয়া বিষয়টি সম্পূর্ণ করিয়াছি। গ্রন্থের যাহা উপকরণ ও উদ্দেশ্য, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র; কারণ, গ্রন্থের বিস্তারিত ক্ষেত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছে। সাহিত্য-সম্পাদক শ্রীমান্ সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি আমাকে কোন গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগী করেন। তাঁহারই বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

বড় ইচ্ছা ছিল, গ্রন্থখানি কোন জীবিত প্রিয়জন বা স্বর্গীয় ভক্তিভাজনের স্মরণার্থ "উৎসর্গ" করি। কিন্তু ভাবিলাম, এ যে

হিন্দুর উৎসর্গ; হিন্দুর উৎসর্গ বড় পবিত্র সামগ্রী। একবার উৎসর্গ করিয়া কি বলিয়া আবার "দত্তাপহরণ" করিব? বিলাতী রীতি অনুসারে উৎসর্গ করিয়া বিলাতী প্রেম ও ভক্তির পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

কলিকাতা, হোগলকুঁড়িয়া।
২৪শে আশ্বিন, সন ১৩০৩ সাল। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

ভ্রমসংশোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	ছত্র
স্বর্গারোহণ করিয়াছে	গিয়াছে	২	১৪,১৫
প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত	১০	৩
এ বিষয়ে	এ বিষয়	১৭	২০
খুন হয়	খুন মনে হয়	৪৭	১১
নাটকারগণ	নাটককারগণ	৪৮	২
কুরুচিই	কুরুচিরই	৪৮	৩
স্বর্গারোহণ	পাতালপ্রবেশ	৫০	৮
স্বর্গারোহণ করিলেন বা পাতালে	পাতালে	৫০	১৫
অশোবনে	অশোকবনে	৫৯	৩
পাশ্চাত্যে	পাশ্চাত্য সাহিত্যে	৮২	২৩
সূর্পনখাকে	সূর্পণখাকে	৮৩	২৩
সূপনখার	সূপণখার	৮৩	২৪
যুবতীয়	যুবতীর	৮৯	৩
স্বাভাবিক	স্বভাবতঃ	৯১	৯
Servent	Servant	৯৫	১
কিন্তু পত্নীভক্তি	পত্নীভক্তি	১১৩	১২
নিভম্প্র	নিষ্প্রভ	১২৪	১৯

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	ছত্র
স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের	স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের	১২৫	১২
কামাক্রোধাদি	কামক্রোধাদি	১২৬	৫
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান	১২৭	১২
প্রতিয়মান	প্রতীয়মান	১২৭	১৪
আর্য্যসাহিত্যে	আর্য্যসাহিত্য	১২৯	১৪
রামায়ণ ও মহাভারত	মহাভারত	১৩০	৪
আর্য্যসাহিত্যে	আর্য্যসাহিত্যে কি	১৩০	৮
কাপুরুষের মত	কাপুরুষের ন্যায়	১৩৮	২
বিবিধ	দ্বিবিধ	১৪৭	১১
সংসারে	সে সংসার	১৬৪	৩
প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত	১৬৯	২৩
পূর্ব্বকালের	পূর্ব্বকালে	১৭১	১
সিঞ্চনে	সেচনে	১৭৭	১০
প্রশস্ত	প্রশান্ত	১৭৯	২

সাহিত্য-চিন্তা।

সাহিত্যের আদর্শ।

আর্য্যসাহিত্যের প্রকৃতি।

ধর্ম্মপ্রাণ আর্য্যজাতি সাহিত্যেও ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ব্যাস প্রকাণ্ড মহাভারত লিখিয়া পতিপ্রাণা গান্ধারীর মুখে গাইলেন—

"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"

যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়। তাঁহার সেই ছত্র কাহার না মুখস্থ আছে, যে ছত্রে তিনি ভগবানকে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমোল্লাসে গাইয়াছেন ;—

"জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাম্ পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

ভগবানকে যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, এবং যাহারা ভগবানের আশ্রিত, তাহাদিগেরই জয় হউক। কেবল এই কথা সঙ্গীত হইয়াছে, এমন নহে ; প্রকাণ্ড মহাভারতে সেই ধর্ম্মপক্ষই, সেই ভগবদাশ্রিত দেবপক্ষই প্রবল হইয়াছে। মনুষ্যের পাপচিত্রও উজ্জ্বলবর্ণে প্রদর্শিত হইয়াছে, কুরুপক্ষীয় চিত্র অপেক্ষা আর কোন্ চিত্র উজ্জ্বল ? কিন্তু তদপেক্ষাও আর এক উজ্জ্বলতর চিত্র

আছে—সে চিত্র পাণ্ডবপক্ষীয় কৃষ্ণার্জ্জুনসহায় ধর্ম্মপক্ষ; এই চিত্রের বর্ণগৌরবে পাপচিত্র নিষ্প্রভ; ধর্ম্মের জয়ে পাপ বিধ্বস্ত —একেবারে সমূলে নিপাতিত। পবিত্র কুরুক্ষেত্র নামক ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পাপ সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

আর এক প্রকাণ্ড চিত্র বাল্মীকির। বাল্মীকির সমগ্র রামায়ণ ভক্তির সুপ্রসারিত মহাদেশ—সে দেশেও ধর্ম্ম বিজয়ী। ধর্ম্মের বিজয়পতাকা অযোধ্যা হইতে লঙ্কার প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত উড়িতেছে। রাক্ষসকুল এত যে প্রবল, তাহা ভগবদ্ভক্তির প্রবলতর তরঙ্গে নিপাতিত হইয়াছে। রামপক্ষের পুণ্যময় রাজ্য, কি লঙ্কা, কি অযোধ্যা, সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রামরাজ্যের সময় হিমালয় হইতে কুমারী অন্তরীপ, কুমারী অন্তরীপ কি, লঙ্কার শেষ সীমা পর্য্যন্ত পুণ্যক্ষেত্র। মহাদণ্ডকারণ্যেও আর অসুরভয় নাই। কোথায় অরণ্যে বসিয়া কোন্ শূদ্র তপস্যা করিতেছে, সেও রামচন্দ্রের স্পর্শে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে।

পৌরাণিক কাব্য ছাড়িয়া, প্রকৃত সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ কর; সেখানেও সেই দৃশ্য। যে ক্ষেত্রের অধিনায়ক, কালিদাস, ভারবি, মাঘ, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি মহাকবিগণ, সে ক্ষেত্রেও সেই ধর্ম্মের জয়। কালিদাস কি ধর্ম্মময় তূলিকারাগে কুমারের অতুলনীয় চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন! সেখানে উমার তপস্যা, হিমালয়ের শিবানুরাগ কেমন অসাধ্যসাধন করিয়াছে! সেই বর্ণগৌরবে সমগ্র কাব্য উদ্ভাসিত। আর শকুন্তলা,—বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলা—যাহার চিত্রে জগৎ মুগ্ধ, সেই শকুন্তলায় কিসের চিত্র? তাহাতে ঋষির আশ্রমচিত্র, শকুন্তলার সহৃদয়তার চিত্র,—যে

সহৃদয়তা সমস্ত পশুপক্ষীকেও প্রেমে আবদ্ধ করিয়াছিল; শকুন্তলার প্রগাঢ় প্রেমানুরাগের চিত্র—যে জগৎবিসারী প্রেমানুরাগ এক প্রবল পতিভক্তিতে সমুন্নত হইয়া তাহাকে তপস্বিনী করিয়াছিল। আর ধর্ম্মময় চিত্র দুষ্মন্তের—যিনি প্রবল ধর্ম্মানুরাগে পূর্ণ হইয়া তেমন জগৎললামভূতা, ঋষিজনপ্রেরিতা, তদাত্মসমর্পিতা, অনায়াসলব্ধা, লাবণ্যময়ী শকুন্তলাকে সভার মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে কেবল আত্মবিস্মৃতির জন্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আবার যখন সেই শকুন্তলাকে মনে পড়িল, তখন তাহার অনুতাপচিত্র দেখিলে কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? কালিদাস সেই ধর্ম্মানুতাপচিত্র "চিত্রদর্শন" অঙ্কে কত উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ধর্ম্মানুতাপ দেখিতে চাও, তবে দেখ, ভবভূতির "ছায়ার" অঙ্কে। রামের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়চিত্র সেই অঙ্কে প্রতিফলিত। সেই সমস্ত চিত্র দেখিয়া বল দেখি, আর্য্য সাহিত্য পড়িয়া ধর্ম্মানুরাগে তোমার হৃদয় পূর্ণ হয় কি না? সহস্র পাপকলঙ্কে তোমার হৃদয় কলুষিত থাকুক না কেন, তবু এই আর্য্য সাহিত্য পাঠে তোমার হৃদয় একটু ধর্ম্মানুরাগে উত্তপ্ত হইবেই হইবে। একটু ধর্ম্মের দিকে বিচলিত হইবেই হইবে। আর্য্য সাহিত্যের ইষ্টার্থ বা অধ্যয়নফল এতই সুন্দর, এতই উৎকৃষ্ট, এতই শান্তরসপরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ!

আর্য্য ও ইংরাজী সাহিত্য।

কিন্তু ইউরোপীয় বা ইংরাজী সাহিত্য পাঠের ফল কিরূপ? যে আদর্শ আর্য্য সাহিত্যের প্রাণ ও গৌরব, যাহা সেই সাহিত্যকে জগৎললামভূত সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সেই উচ্চাদর্শের

ধর্ম্মনৈতিক সুন্দর আদর্শ কি আমরা ইংরাজী সাহিত্যে দেখিতে পাই? তাহাতে মনুষ্যসমাজ ও মানবপ্রকৃতির চিত্র আছে বটে, কিন্তু সে চিত্র কি ততই ধর্ম্মগৌরবে পূর্ণ? ইংরাজী সাহিত্যে স্থলে স্থলে ধর্ম্মসৌন্দর্য্য নাই, এমত নহে; কিন্তু তাহা এত নিবিড়বনাচ্ছন্ন যে, তাহার কান্তি তত পরিদৃশ্য হয় না। ঘন বন-মধ্যে যেন একটি নবমল্লিকা নিভৃতে তাহার সৌন্দর্য্য লইয়া বিলীন হইয়াছে। চারি দিকে কণ্টকপূর্ণ বিটপী লোকলোচনের অপ্রিয়তা সাধন করিয়াছে। চারি দিকে হিংস্র জন্তুগণের মহা-ভীষণ রবে অরণ্য পরিপূর্ণ—এতই পরিপূর্ণ যে, সে রবে পক্ষীর সুকণ্ঠনিঃসৃত কাকলী মিলাইয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়গণ স্পর্দ্ধা করেন যে, আমরা প্রকৃতির চিত্রকর; যেন প্রকৃতি-চিত্র প্রাচ্য সাহিত্যে নাই। প্রকৃতি-চিত্র আর্য্য সাহিত্যে আছে, ইংরাজী সাহিত্যেও আছে; তবে প্রভেদ এই, ইংরাজী সাহিত্যে সেই প্রকৃতির সমলা নগ্নমূর্ত্তি, আর্য্য সাহিত্যে তাহার ধর্ম্মোন্নত মধুরিমা। ইংরাজী সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির পাশব ও আসুরিক বর্ণগৌরব, আর্য্য সাহিত্যে সেই প্রকৃতির দেবতুল্য ভাবের উৎকর্ষ। মানব-প্রকৃতি দেবভাবে সমুন্নত হইয়া কেমন সুন্দর হইয়াছে, তাহা আর্য্যচরিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে; সেই সৌন্দর্য্যে তাহার আসু-রিক ভাব প্রচ্ছন্ন; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপ-রীত। ইংরাজী সাহিত্যে মানব প্রকৃতির পাশব ভাবের এবং ঐন্দ্রিয়িক প্রবৃত্তিসমূহের এত প্রাধান্য যে, তাহাতে তাহার দেব-ভাব সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী কাব্য সাহিত্যের যিনি অগ্রগণ্য, ইংরাজ জাতির গর্ব্বস্বরূপ সেই সেক্সপিয়ারের দৃশ্য-কাব্যের আলোচনায় এ কথা প্রতিপাদিত করা যাইতেছে।

আমরা তাঁহার কাব্যবিশেষের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি না, কিন্তু তাঁহার সমগ্র নাটকাবলির অধ্যয়নফলস্বরূপ যাহা পাই, তাহারই বিষয় বলিতেছি।

সেক্সপিয়ার ও মানবপ্রকৃতি।

সেক্সপিয়ার পাশ্চাত্য ইউরোপীয় জগতের জনসমাজ এবং মানবপ্রকৃতির চিত্রকর; কেবল চিত্রকর নহেন, তিনি একজন মহাকবি। তিনি সেই জনসমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও লোকজনের সজীব চিত্র দিয়াছেন। চিত্র সকল এত পরিপাটী, এত প্রকৃত, এত প্রস্ফুটিত, যেন ফটোগ্রাফের মত বোধ হইতে থাকে। তাঁহার নাটকীয় ব্যক্তিগণকে যেন সজীব মনে হয়। এ বড় কম ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাঁহার যে সকল নাটক বিয়োগান্ত নহে, তাহাদিগের ধাতু এই প্রকার। কিন্তু কবির প্রধান সম্পত্তি তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি। এই দৃশ্যকাব্যসমূহে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। এ রাজ্যে তিনি শুদ্ধ চিত্রকর নহেন, এখানে তাঁহার সৃষ্টিচাতুর্য্য দেদীপ্যমান। কাব্যরসে তাঁহার ট্র্যাজিডিগুলি উচ্ছলিত, সৃষ্টি-চাতুর্য্যে তাহা পরিশোভিত। এজন্য ট্র্যাজিডিসমূহই তাঁহার যশের প্রধান নিদানস্বরূপ হইয়াছে। ট্র্যাজিডি ও কমিডি, এই উভয়বিধ রচনাকৌশলে তিনি ইউরোপীয় কাব্যজগতে অসামান্য কবি। তাঁহার এই অগ্রগণ্য ট্র্যাজিডিসমূহ সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান বক্তব্য।

সেক্সপিয়ার মানবপ্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে কতদূর কৃতকার্য্য, এবং সর্ব্বত্র কৃতকার্য্য কি না, সে কথার বিচার করা আমাদের

অভিপ্রেত নহে। তবে তিনি যাহা বলিয়া ইউরোপে বিখ্যাত, আমরা তাহারই কথা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্রাঙ্কনে তিনি অসাধারণ কবিরূপেই সুবিখ্যাত। কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহার মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্রাঙ্কনে মোহিত হইয়া বলিয়া উঠিয়াছেন :—

"O Nature! O Shakspere! Which of ye drew from the other!"

"হে প্রকৃতি! হে সেক্সপিয়ার, তোমরা কে কাহার অনুচিত্র!"

যদি তিনি মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিয়া থাকেন, তবে তিনি কিরূপ চিত্র দিয়াছেন? মানবপ্রকৃতি দোষগুণের আধার ;— তাহাতে একাধারে পশুত্ব, মনুস্যত্ব এবং দেবত্ব বিদ্যমান। আহার নিদ্রা, রোগ, শোক, কামাদি রিপুর সহিত মানব পশুবৎ ; বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিচারাদি সম্পন্ন হইয়া মানবের মনুষ্যত্ব ; এবং দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, ভক্তি প্রভৃতি গুণে মনুষ্য দেবতুল্য। এই ত্রিবিধ গুণে—এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণে—মানবপ্রকৃতি সমলা। খ্রীষ্টধর্ম্মানুসারেও মানবের পাপাংশই অধিক। জনসমাজের অধিকাংশ লোকে কিছু শ্রেষ্ঠগুণের পরিচয় নাই, সমাজের অধিকাংশই রাজসিক, এবং তমোগুণান্বিত ; সুতরাং জনসমাজ অধিকতর সমল। যিনি সেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দিতে যাইবেন, তাঁহাকে ততোধিক সমলা প্রকৃতিরই ছবি আঁকিতে হইবে এবং যাঁহাকে জনসমাজের চিত্র দিতে হইবে, তাঁহাকে রাজসিক ও তমোগুণান্বিত সাধারণ লোকসমাজেরই প্রতিকৃতি দিতে হইবে ; নহিলে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের চিত্র যথাযথ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয় জনসমাজ যে সকল বিশেষ দোষগুণের

আধার, তাহাতে যে বিশেষ প্রকার তমঃ ও রজোগুণের বিকাশ হইয়াছে, ইউরোপীয় কবির চিত্রে তাহারই প্রকৃত ছবির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। সেক্সপিয়ারে যদি প্রকৃতি যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তবে তাঁহার চিত্রগুলিতে মানবপ্রকৃতি ও জনসমাজের আলোকান্ধকার এবং দোষ গুণই ঠিক প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আলোক আঁধার এবং দোষ গুণ সেইরূপ পরিমাণে প্রতিবিম্বিত, যেরূপ পরিমাণে প্রকৃতিতে তাহা জাজ্বল্যমান। তাহার কমও নহে বেশীও নহে। পরিমাণের ন্যূনাধিক্য ঘটিলে চিত্র প্রকৃতির যথাযথ প্রতিবিম্ব হইবে না। ইউরোপীয় জনসমাজে ও লোকচরিত্রে যে পরিমাণে এবং যে প্রকার বিশেষ দোষ গুণের সমাবেশ, সেক্সপিয়ার তাহারই অনুকৃতি। তৎকালে খৃষ্টানের মনে মানবপ্রকৃতি যত দূর পাপ-মলিন, তত দূর মলিনতা সেক্সপিয়ারে। চিত্রকররূপে সেক্সপিয়ার এইরূপ; কিন্তু সেক্সপিয়ার ত নিরবচ্ছিন্ন চিত্রকর নহেন; তিনি যে স্রষ্টা; তিনি কিসের সৃষ্টি করিয়াছেন?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবির সৃষ্টিভেদ।

জনসমাজকে তন্ন তন্ন করিয়া যিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, যেন তাহার যথাযথ ফটোগ্রাফ ছবি তুলিতে পারেন, তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, তাহাতে দোষের ভাগই প্রচুরপরিমাণে বর্ত্তমান। কবি জগতের শিক্ষাদাতা। কবি কিরূপে শিক্ষা দিবেন? যাহাতে জনসমাজের সেই দোষের পরিমাণ কমে, এমন উপায় তাঁহাকে করিতে হইবে।

জনসমাজকে অধিকতর সত্ত্বগুণসম্পন্ন করা কি উপায়ে সম্ভবে, তাহারই নির্ণয় করা কবির কার্য্য। কবি সেই উপায়াবলম্বনে জগতের গুরু। এই উপায়ের ভেদেই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য কবির প্রভেদ। এই উপায়াবলম্বনে কবি সৃষ্টিকর্ত্তা ও শিক্ষাদাতা। পাশ্চাত্য কবি যাহার সৃষ্টি করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, প্রাচ্য কবি তাহা করেন নাই; প্রাচ্য কবি বিভিন্ন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। এক জন মানবসমাজের রজঃ ও তমোগুণকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহার কুফল কত ভয়ানক; অন্য জন সত্ত্বগুণকে সমুজ্জ্বল করিয়া সেই দিকে মানবসমাজকে আকৃষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেই সাত্ত্বিক রাজ্য কি সুখের আলয়। এক জন ঘোর নরকের সৃষ্টি করিয়া তাহার দাহ ও যন্ত্রণা দেখাইয়া লোক-সমাজকে পাপ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য জন স্বর্গের সৌন্দর্য্য ও সুখের দিকে লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই রাজ্যে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবি সেক্সপিয়ারে নরক ও তাহার যন্ত্রণার সৃষ্টি, প্রাচ্য কবি ব্যাস বাল্মীকি পুণ্যময় পবিত্র স্বর্গের সৃষ্টিকর্ত্তা। বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা নিজ নিজ সৃষ্টিকৌশল দেখাইয়া গিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে কোন্ কবি অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, লোকসমাজের ফলাফল দর্শনে তাহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। হিন্দু জনসমাজ, কি ইউরোপীয় জনসমাজ অধিকতর ধর্ম্মশীল, অধিকতর সাত্ত্বিক ভাবে পরিপূর্ণ, অধিকতর দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা ও ভক্তিগুণে সম্পন্ন? কোন্ জনসমাজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল? এই প্রশ্নের সমাধান করিলেই সেই কবিগণের সৃষ্টির ফলাফলও নির্ণীত হইবে।

পাশ্চাত্য কবির উপকরণ তদীয় সৃষ্টির অনুকূল। তাঁহার

উপকরণ ট্র্যাজিডি। ট্র্যাজিডি যে ধরণের রচনাপ্রণালী, তাহাতে নরকের সৃষ্টি ও তাহার দাহ এবং যন্ত্রণা দেখাইবারই উপযোগী। ট্র্যাজিডি অসুরসৃষ্টির যত উপযোগী, দেবসৃষ্টির তত উপযোগী নহে। কারণ ট্র্যাজিডিতে মানবীয় প্রচণ্ড পাশব প্রবৃত্তিকে এত প্রবলা করিতে হয়, যেন তাহা খুনে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়। অনেক সময়ে সেই প্রচণ্ডতা প্রায় অতিমানুষী হইয়া পড়ে। আমরা সচরাচর সংসারক্ষেত্রে রিপুপ্রাবল্যের যে প্রকার দৃষ্টান্ত পাই, তাহাতে খুন দেখিতে পাই না। খুন জনসমাজে কিছু সর্ব্বদা ও সচরাচর ঘটিতেছে না। বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত জনপূর্ণ সমাজে দুই দশটি খুন ঘটে। সেই খুনে দেখিতে পাওয়া যায়, হয় লোভ, না হয় বিদ্বেষ, না হয় হিংসা, না হয় স্ত্রীর প্রতি সন্দেহজনিত কোপাগ্নি, অতিমানুষী সীমায় উঠিয়া খুনে পর্য্যবসিত হইয়াছে! সেক্সপিয়ার সংসারক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত পাইয়া তাঁহার ট্র্যাজিডির সৃষ্টি-রাজ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি লেডি ম্যাক্‌বেথ ও লর্ড ম্যাক্‌বেথের সৃষ্টি করিয়াছেন। ওথেলো এবং ইয়োগো, রোমিও এবং জুলিয়েট, ব্রুটস এবং রিচার্ড প্রভৃতি সকলেই তাঁহার অমানুষী সৃষ্টি—ট্র্যাজিডির সম্যক্ উপকরণ। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নরক-যন্ত্রণা ও দাহ। এই সৃষ্টির মধ্যে রিপুপ্রাবল্য আসুরিক সীমায় আসিয়াছে। শ্লিগেল্ (Schlegel) বলিয়াছেন, লেডি ম্যাক্‌বেথ একটি Female Fury, স্ত্রী অসুরী। তত সাহস, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নির্দ্দয়তা কেবল অসুরেই সম্ভব। সেই লেডি ম্যাক্‌বেথ বলিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে আমি যাহাকে স্তন পান করাইতেছি, তাহার মস্তক তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতে পারি। আমাদের পূতনাসুরীর সঙ্গে তাহার কত সাদৃশ্য! পূতনা স্তন-

পান করাইয়া না শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিতে গিয়াছিল? ততই বিশ্বাসঘাতকতা, ততই দেবদ্রোহিতা পূতনায়ও লক্ষিত হয়। যে আসুরিক প্রেমে প্রজ্জ্বলিত হইয়া জুলিয়েট সুন্দরী রোমিওর কাছে নানা বাক্‌ছলে আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহার যৌবনলালসার পরিচয় দিয়াছিলেন, তিনি যদি সেইরূপ করিয়া এক জন রাম বা লক্ষ্মণের কাছে যাইতেন, তাঁহার কি দশা ঘটিত? নিশ্চয়, সূর্পণখার মত তাঁহার দশা ঘটিত। সূর্পণখা বিফল হইয়া মহা সমরাগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন, জুলিয়েট আত্মঘাতিনী হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। সামান্য সূত্রে ইয়াগোর চাতুরীজাল এত অমানুষী সীমায় আসিয়াছিল যে, তাহাতে তাহার অন্নদাতা ওথেলোকে স্ত্রীহত্যা পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। রিচার্ড না বলিয়াছিল যে, আমি যথন প্রকৃতির হস্তে বিকলাঙ্গ হইয়া সৃষ্ট হইয়াছি, তথন আমি কর্ত্তব্যেও অসুর হইয়া উঠিব।

——"Since I cannot prove a lover,
* * * *
I am determined to prove a villain."

প্রকৃতপক্ষেও সেক্সপিয়ার তাহাকে অসুররূপেই প্রদর্শিত করিয়াছেন। আর আমরা কত বলিব?

শুদ্ধ সেক্সপিয়ারে কি এই আসুরিক আদর্শ? বিলাতী শ্রব্য কাব্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই মহাকবি মিল্টন তাঁহার মহাকাব্যে (Paradise Lost) কি আদর্শ দিয়াছেন? তুমি বোধ হয় বহুকাল পূর্ব্বে কলেজে মিল্টনের কিয়দংশ পড়িয়াছিলে? পরে, ঘরে বসিয়া তাহার অপরাংশের অধ্যয়ন শেষ করিয়া থাকিবে? সেই পাঠের কিরূপ স্মৃতি তোমার অন্তরে জাগিতেছে? তোমার অন্তরে সেটানের (Satan) ভীষণ আসুরিক মূর্ত্তি ব্যতীত আর

কোন্ মূর্ত্তি তত জাজ্বল্যমান ? সয়তান মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া সর্ব্বশক্তিমানরূপে কার্য্য করিতেছে। ত্রিভুবন তাহার কর্ম্মক্ষেত্র—সেই কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অপরিমেয় শক্তি ও কৌশলে ভগবানের সৃষ্টি বিপর্য্যস্ত। যে ভগবান বাস্তবিক সর্ব্বশক্তিমান, সেই বজ্রধর মিল্টনের মহাকাব্য মধ্যে যে কোথায় আছেন, খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সয়তানের প্রভূত বিক্রম ও আসুরিক ক্ষমতা, তাহার দেবদ্রোহিতা ও দেবদ্বেষ কাব্যময় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত। সয়তানের পরই "এড্যাম এবং ইভের" দেবদ্রোহিতা এবং দেবভক্তির বিচ্যুতি-চিত্র—সয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া কেমন তাহারা পাপে অনুরক্ত হইল, এবং তাহার ফলাফল কি হইল,—পাপের এই বিষময় পরিণাম দেখাইবার নিমিত্ত মিল্টনের এত আয়োজন। মিল্টনের মনে মানবপ্রকৃতির যে তমোময় মলিন ভাব, সেই প্রকৃতিকে চিত্রিত করিবার জন্য, তাঁহার মহাকাব্যের সৃষ্টি। তবে তিনি তাহার দেবভাব দেখাইবেন কিরূপে ? যে প্রকৃতির প্রভূত বল আসুরিক প্রবৃত্তিস্রোত, যে অদম্য কুপ্রবৃত্তিস্রোত কোন নৈতিক শাসনে শাসিত নহে, সেই আসুরিক প্রকৃতির পাপময় চিত্র মিল্টন আঁকিয়াছেন। যেমন কুরুপক্ষে গদাধারী আসুরিক দুর্য্যোধনই প্রবল, যাহার প্রাবল্যে লোভী দ্রোণ ও কর্ণের সামরিক বীর্য্য অধীন হইয়া যথেচ্ছ কার্য্য করিতেছে, কোন নৈতিক শাসন ও কাহারই সুপরামর্শ মানিতেছে না—গান্ধারী, বিদুর, ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, সেই আসুরিক বলপ্রধান কুরুপক্ষ যেমন দেবদ্রোহী হইয়া ধর্ম্মের বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া মহাভারতের মহা ব্যাপার এবং তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া পৃথিবী

তোলপাড় করিতেছে, তদ্রূপ ভয়ঙ্কর চিত্র মিল্‌টনের মহাকাব্যে এই চিত্রে কলঙ্কারোপ করে, এমত প্রতিযোগী দেবচিত্র নাই।

আর্য্যসাহিত্যে সৃষ্টির সম্পূর্ণতা।

এই পাপপূর্ণ সংসারের অনুচিত্র আঁকা তত কঠিন নহে। কারণ, পাপপূর্ণ সংসার তো পড়িয়া রহিয়াছে—যে দিকে দেখিবে, সেই দিকেই পাপের কলঙ্কিত মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ফটো তোল। সেক্সপিয়ার এ ফটো তুলিয়া তো সন্তুষ্ট হয়েন নাই; তিনি তদপেক্ষা অনেক দূর আসিয়াছেন। তিনি সেই ফটো হইতে লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন—যাহা সামান্য সংসারে নাই, অথবা যদি থাকে, কচিৎ কখন তেমন আসুরিক সৃষ্টি জন্মে। আর্য্যকবি ঠিক ইহার বিপরীত দিক দেখান। তিনি দেখান, ধর্ম্মের অসাধারণ মূর্ত্তি। যে সকল ধর্ম্ম-মূর্ত্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ছবি আর সাহিত্যে দিবার প্রয়োজন কি? একবার চক্ষু চাহিলেই চারি দিকে সে প্রকার সামান্য মূর্ত্তি বিদ্যমান দেখিতে পাইবে। সাহিত্যে যে ছবি আঁকিবে, তাহা চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকিবে। সেই ছবিতে অসামান্য রূপের সমাবেশ চাই। সেই অসামান্য রূপ সামান্য চিত্রের রূপ দেখিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে। এই অমানুষী রূপ-সৃষ্টির আদর্শ আর্য্য কবিগণ তিলোত্তমায় দেখাইয়াছেন। তিলোত্তমা যেমন বাহ্য রূপের সৃষ্টি, আর্য্য সাহিত্যের আদর্শ সকল তেমনি মানসিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। তিলোত্তমা গড়িতে যে সেক্সপিয়ার জানিতেন না, এমত নহে—তিনি অনেকগুলি বাহ্য তিলোত্তমা

গড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার তিলোত্তমা মিরাণ্ডা—"Of every creature's best" রোস্থালিণ্ড্ এবং হার্মিয়ন্। কিন্তু মানসিক সৌন্দর্য্যের তিলোত্তমা গড়িতে গিয়া তিনি আর্য্যকবিগণের নিকট পরাভূত হইয়াছেন। তাঁহার মিরাণ্ডা শকুন্তলার নিকট পরাভূত। তাঁহার রোস্থালিণ্ড্, হার্মিয়ন্, ইস্বাবেলা ও হেলেনা তত অসামান্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি নহে। কিন্তু ট্র্যাজিডিতে তিনি আর এক প্রকার তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিলোত্তমার সৃষ্টি করিতে গিয়া লেডি ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতি যত আসুরিক দৈত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। রোমিও, জুলিয়েট, টাইবল্ট, ইয়্যাগো, ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ, গনারিল, জন, রিচার্ড দি থার্ড্ প্রভৃতি নহিলে কি ট্র্যাজিডির ভয়ঙ্কর চিত্র ও খুন সংঘটিত হয়? আমাদের সাহিত্যে এরূপ ভয়ঙ্কর রিপুপরবশ অসুরের সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহারা অসুর বলিয়াই কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা ধর্ম্মদ্বেষী ও দেবদ্রোহী। মিল্টনের মহাকাব্যে একমাত্র প্রকাণ্ড অসুরের সৃষ্টি; কিন্তু আমাদের মহাকাব্যদ্বয়ে তদ্রূপ কত শত অসুর। বৃত্র, তারক, রাবণাদি অসুর ও রাক্ষসসমূহ দেবদ্রোহী হইয়া কি তুমুল কাণ্ডই না ঘটাইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অসুরনাশন দেব, গন্ধর্ব্ব ও ধর্ম্মবীর সকলেরও সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং লোকের দৃষ্টি সেই অসুর হইতে সুরসৌন্দর্য্যের দিকেই পতিত হয়। তাহাতে ধর্ম্মের জয় হয়। আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্মের জয় অতি উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রিপুর প্রমত্ততা ও পাপের বিক্রমকে মূর্ত্তিমান করিয়া প্রদর্শন করা যদি মহাকবির পরিচায়ক হয়, তবে তাহার সহিত জিতেন্দ্রিয়তা এবং ধর্ম্মকেও মূর্ত্তিমান করিতে কি কবিত্বের পরিচয় হয়

না? মানবপ্রকৃতির এক দিককে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়া অন্য দিককেও সমুজ্জ্বল করা উচিত। তাহা হইলেই মানবপ্রকৃতির যথাযথ চিত্র দেওয়া হয়। ব্রহ্মাণ্ডের চিত্রে স্বধু সয়তানকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইলে কি হইবে? তাহার সঙ্গে ভগবানের অষ্ট ঐশ্বর্য্য ও সৌম্য মূর্ত্তিরও শোভা দেখান উচিত। তবে ত ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শোভা ও ভীষণ মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান হইবে। আর্য্যসাহিত্যে এইরূপ সম্পূর্ণতার সৌন্দর্য্য। তাহাতে প্রকৃতি, পুরুষের পার্শ্বে সংসারের কদম্বমূলে পরিশোভিতা। তাহাতে মূর্ত্তির দুই দেশই সমান উজ্জ্বল। দেহের সকল অবয়ব সমান পরিস্ফুট ও সমপরিমাণবিশিষ্ট। তাহাতে স্কন্ধকাটার সৃষ্টি নাই; কিম্বা প্রকাণ্ড ধড়বিশিষ্ট অঙ্গহীন অসুরের সৃষ্টি নাই। সেক্সপিয়ারে অসুরনাশন চিত্রেরও সৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু সে সৃষ্টির তত বর্ণগৌরব নাই, যদ্দ্বারা ম্যাকৃডফ্ কি ব্যাঙ্কো, ম্যাকৃবেথের উপর উঠিতে পারে। রিচার্ড দি থার্ড, জন প্রভৃতির প্রতিযোগী চিত্র কই? তাঁহার আসুরিক কৃষ্ণমূর্ত্তি সকল অসামান্য সৃষ্টি, তদ্বিপরীত শ্বেত মূর্ত্তি সকল অতি সামান্য চিত্র। সুতরাং কৃষ্ণকায়গণই অধিকতর মূর্ত্তিমান হইয়াছে। পাপের গৌরব ও ঘোর ঘটায় ধর্ম্ম নিষ্প্রভ।

পুণ্যাদর্শের আবশ্যকতা ও উৎকর্ষ।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম দেখাইয়া মানবকে পাপপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার বিশিষ্ট উপায় বলিয়া, ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির আসুরিক সৃষ্টির সমর্থন করা যাইতে পারে। তদ্দ্বারা

কত দূর পাপনিবারণ হয়, সে কথার বিচার না করিয়া যদি স্বীকার করা যায় যে, ট্র্যাজিডি পাঠের সেইরূপ সুফল সম্ভাবিত, তাহা হইলেই বা কি হইল? মানবকে সুধু পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেই কি যথেষ্ট হয়? মানবের পারমার্থিক ক্ষুধা কিরূপে সন্তৃপ্ত হয়? যে পারমার্থিক লালসায় উত্তেজিত হইয়া মানব জগৎকে শোভিত করিয়াছে, জগতে শান্তি ও অমৃতধারা প্রবাহিত করিয়াছে, মানবের সেই পারমার্থিক লালসা যে অত্যন্ত প্রবলা। মানব-অন্তর যে দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, প্রেম, স্নেহ ও ভক্তিরসের আধার; সে রসের পরিতৃপ্তিসাধনের জন্য মানব অহরহঃ ব্যস্ত রহিয়াছে। জেল দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইল না, লোককে ধর্ম্মশীল করিতে হইবে। কিসে সদ্বৃত্তি-সমূহের তৃপ্তিসাধন হয়, তাহার উপায় কি? তন্নিমিত্ত কি ধর্ম্মা-দর্শসৃষ্টির আবশ্যকতা নাই? এক জন পরম পবিত্র পুণ্যবান লোকের চরিত্রপাঠে যত পরিতোষ ও আনন্দ জন্মে, এবং মন যত আকৃষ্ট হয়, তত কি পাপচরিত্রের ভীষণ পরিণাম-কল্পনায় হইতে পারে? মহাজনের উদারতায় এবং দানবীরের মহত্ত্বে মন যত মোহিত হয়, অন্তরের যত স্ফূর্ত্তি হয়, তত কি আর কিছুতে হইতে পারে? পাপকণ্টক কাটিয়া মনুষ্যের মনে সুবীজ-রোপণের বিশিষ্ট উপায়—পুণ্যের পবিত্রতাদর্শন ও ধর্ম্মাদর্শ।

পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিলে যেমন পাপস্পর্শ ঘটে, তেমনি ধর্ম্মের পুণ্যজ্যোতিঃ সর্ব্বদা দেখিলে মনের মলিনতা অপ-নীত হইয়া পবিত্রতার সঞ্চার হয়। ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠির ও রামের চিত্র সর্ব্বদা কল্পনায় রাখিলে কি মন পবিত্র হয় না? অথচ যুধিষ্ঠির ও রামের পবিত্রতা সচরাচর মানবে পরিদৃষ্ট হয় না।

তাঁহাদের পুণ্যময় চিত্র অসাধারণ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইলেও, মানবসমাজ তাঁহাদের আদর্শে উন্নীত ব্যতীত কিছু অবনত হইবে না। পুণ্যের আকর্ষণ এমনি, পবিত্রতার লাবণ্য এমনি, ধর্ম্মের জ্যোতিঃ এমনি যে, অতিমানুষ হইলেও তাঁহাদের অসাধারণ ক্ষমতা। মানব সেই ক্ষমতায় নীয়মান না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদের অতিমানুষ ধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া মানবসমাজ সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, সেই লাবণ্যে মোহিত হয়, এবং সেই জ্যোতিঃতে আলোকিত হয়। মানব-প্রকৃতিতে যে দেবত্বের সমাবেশ আছে, সেই দেবত্বের সহিত এই আকর্ষণশক্তি। নহিলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মবল কিরূপে হিন্দু সমাজকে চালাইয়া আসিতেছে; তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে? হিন্দু সমাজ আজিও অসাধারণ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

সাহিত্যে অতিমানুষের উপকরণ।

যাহা আলোকসাধারণ, তাহাই অতিমানুষ। অতিমানুষ বা অসামান্য না হইলে প্রাকৃত জনগণের স্মৃতিপথারূঢ় হয় না। যাহা সর্ব্বদা ও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে না। যাহা অসামান্য ও অদ্ভুত, তাহাই বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষণ করে, সুতরাং অনেক কাল স্মরণ থাকে। যাহা সাধারণ লোকের কল্পনাতীত, তাহাই কবির সৃষ্টিরাজ্যের অন্তর্গত। সুতরাং কবির সৃষ্টি প্রায় অদ্ভুত হইয়া পড়ে। অদ্ভুতকে আরও অদ্ভুত এবং চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কবি প্রকৃতির সীমা একটু অতিক্রম করিয়া অতিমানুষে আসিয়া পড়েন। লেডি ম্যাক্‌বেথ

সেই একটু প্রকৃতি-অতীত সীমার দৃষ্টান্ত। ওথেলোও কিয়দংশে অস্বাভাবিক চিত্র। তদ্রূপ রিচার্ড দি থার্ড, গনারিল, ব্রুটস, জন প্রভৃতি। মহাকাব্যের কল্পনায় এই অতিপ্রাকৃতিক বা অতি-মানুষী কল্পনা কিছু অধিকতর দেখা যায়। কারণ, অতি-অদ্ভুত নহিলে লোকের চিরস্মরণীয় হয় না। মিল্টনের সয়তানের কল্পনা অতি-অদ্ভুতে পরিপূর্ণ। অতি-অদ্ভুত বলিয়া সেই সৃষ্টি এত মহান্ ও প্রকাণ্ড যে, মানবকল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। তদ্রূপ, এড্যাম এবং ইভের সরলতা এবং পবিত্রতা অতি-অদ্ভুত। তাঁহার নরকের চিত্র যত অদ্ভুত ও বিস্তৃত, Paradiseএর বর্ণনা তত নহে। এ জন্য তাঁহার নরকচিত্রই অধিকতর স্মরণীয় হইয়াছে।

পাপের অতিমানুষ চিত্রের দোষ এই, মিল্টনের সয়তানের মত, তাহার প্রকাণ্ডতা, উচ্চতা এবং গাম্ভীর্য্যে মন এত আকৃষ্ট হয় যে, সেই চিত্রকে যত দূর ঘৃণার্হরূপে সৃষ্টি করা অভিপ্রেত, তাহা তত ঘৃণার্হ বোধ হয় না। কারণ, তাহার প্রকাণ্ডতা বা অদ্ভুতরসে কতকটা চিত্তরঞ্জন ঘটে। সয়তানের অদ্ভুত ও বৃহৎ কল্পনায় মন মোহিত হওয়াতে, তাহা তত ঘৃণার্হরূপে প্রতীয়মান হয় না। অথচ সয়তান স্বয়ং পাপমূর্ত্তি। কিন্তু অতিমানুষ পুণ্যের চিত্রে এরূপ কুফল ফলে না। পুণ্যচিত্রমাত্রই ত সাধারণ জনগণের চিত্তরঞ্জন, তাহাতে সেই চিত্রে অদ্ভুতের সঞ্চার হওয়াতে সামান্য জনগণ দ্বিগুণ মোহিত হয়। প্রাকৃতিক কি না, এ বিষয়ে তাহারা বিচার করিতে যায় না। অতিমানুষ পুণ্যের পবিত্রতায় তাহা-দের মন এত মোহিত হইয়া পড়ে যে, সে বিচার অন্তরে স্থান পায় না, বা মূলেই উদিত হয় না। সেই পবিত্রতা তাহাদের কল্প-নাকে চিরদিন অধিকার করিয়া থাকে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি মনুষ্যের পশুবৃত্তি। দয়া দাক্ষিণ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি তাহার দেবভাব। কাম, ক্রোধ লোভাদির অতি অদ্ভুত কল্পনা আসুরিক এবং দয়া ধর্ম্ম ভক্তি প্রভৃতির অতি অদ্ভুত কল্পনাই দেবোচিত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এই আসুরিক কল্পনার সমৃদ্ধি এবং প্রাচুর্য্যে দিব্য কল্পনা বিমলিন ও প্রচ্ছন্ন; কিন্তু আর্য্য-সাহিত্যে ঠিক তাহার বিপরীত। তথায় পাশব মানবপ্রকৃতি, দিব্য প্রকৃতির ছটায় নিষ্প্রভ। রামের পুণ্যজ্যোতিঃ মানবকল্পনাকে এত অধিকার করিয়াছে যে, রাবণের চিত্র আর স্মরণ থাকে না, তাহা যেন পাপান্ধকারে বিসর্জ্জিত হয়। ভরত ও রামের প্রগাঢ় পুণ্যরসে মন এত বিগলিত হয় যে, তাহাতে কৈকেয়ী ও মন্থরাকে অধিকতর ঘৃণিত বোধ হয়। তাহাদের পাপকল্পনা, ভরত ও রাম, এবং কৌশল্যা ও সীতার চরিত্রকে অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, পাপের নিশান্ধকারে অস্ত গিয়াছে।

অতিমানুষ ধর্ম্মাদর্শ যেমন রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরে, অতিমানুষী ভ্রাতৃভক্তি তেমনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নে, এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবে। পিতৃভক্তি পুরু ও ভৃগুরামে। ভৃগুরাম বুঝি পিতৃভক্তির অবতার ছিলেন। তিনি সেই পিতৃভক্তিতে চালিত হইয়া পিত্রাদেশপালনার্থ মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিতে পারিবেন, এমন আশা ছিল বলিয়া তিনি মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং বাস্তবিক তিনি সেই মাতাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সামান্য জনগণের মনে পিত্রাদেশের গৌরববৃদ্ধি করাই কবির উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য বিলক্ষণ সিদ্ধ হইয়াছে। মহাকাব্যের সৃষ্টিচাতুর্য্য

দেখাইতে হইলেই অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ করা চাই। তাই অদ্ভুত রসেই গাম্ভীর্য্যসাধন হয়। মিল্টনের সয়তান-সৃষ্টিতে যেমন অদ্ভুতের প্রকাণ্ড রচনা দেখা যায়, আমাদের মহাকাব্যেও তেমনি অদ্ভুত কাণ্ড সকল বর্ণিত হইয়াছে। না হইলে রসের প্রগাঢ়তা হয় না। পিতৃভক্তির অতিমানুষী পরিপূর্ণতা দেখাইবার জন্যই তদ্রূপ অদ্ভুত মাতৃহত্যার কাণ্ড কল্পিত হইয়াছে। পরশুরাম সেই পিতৃভক্তিতে উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীকে একবিংশবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। মাতৃভক্তির অবতার পঞ্চ পাণ্ডব। পিতৃগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ ভগীরথ কি অসাধ্যসাধনই না করিয়াছিলেন। পতিভক্তির দৃষ্টান্ত আমাদের আর্য্যসাহিত্যে অসংখ্য ;—সতী, পার্ব্বতী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সীতা, সাবিত্রী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, কুন্তী, দময়ন্তী, অরুন্ধতী প্রভৃতি। তাঁহাদের অমানুষ প্রেম, ভক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। দানবীর—কর্ণ, বলি ও হরিশ্চন্দ্র। অমানুষ সত্যপালন রামচন্দ্রে। অমানুষ ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ।

আর্য্যসাহিত্যের এক দিকে এই সমস্ত ধর্ম্মাদর্শের পবিত্র সৌন্দর্য্য, অন্য দিকে আসুরিক সৃষ্টিসমূহে পাপের ঘৃণিত মূর্ত্তি ও ভীষণ পরিণাম। এক দিকে পাপের দমন, অন্য দিকে পুণ্যের আকর্ষণ—এই উভয়বিধ চিত্রে সম্পন্ন হইয়া আর্য্যসাহিত্যের আদর্শ যেমন জনসমাজকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে চাহে, তেমনি পুণ্যের পথে আকৃষ্ট করে। সে আদর্শ মানবকে কেবল নিষ্পাপ নহে, তাহাকে দেবতা করিতে চাহে। তদপেক্ষা উচ্চাদর্শ আর কি হইতে পারে, আমরা জানি না।

এই দেখুন, আর্য্যসাহিত্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাচিত্র আমাদের এই কথা কেমন সমর্থন করিতেছে।

ভীমসেনের গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ হইলে, যখন তিনি শোণিতাক্ত হইয়া কাতরস্বরে রোদন করিতেছেন, তখন অশ্বত্থামা তাঁহার সন্তোষার্থ পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক আনিবার জন্য সৈনাপত্য গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তিনি ঘোর নিশীথে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া যে বীভৎস ব্যাপারে লিপ্ত হন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। সেই হত্যাকাণ্ড ও শিশুমস্তকচ্ছেদনের কথা শুনিলে কাহার শরীর না শিহরিয়া উঠে? যে দুর্য্যোধনের সান্ত্বনার্থ তিনি এ কার্য্যে লিপ্ত হয়েন, তিনি পর্য্যন্ত তাহাতে সন্তোষলাভ করা দূরে থাক, বরং বিষণ্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কুরুপক্ষীয় এই ভয়ানক আসুরিক বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া কাহার মনে ঘৃণার সঞ্চার না হয়? কিন্তু এই পাপ-চিত্রের পরই পাণ্ডবপক্ষে কেমন এক বিপরীত সুন্দর দৃশ্য অভিনীত হইতেছে! দ্রৌপদী পঞ্চ শিশুর হত্যা শুনিয়া কাঁদিয়া অধীরা হইয়াছেন, তাঁহার কাতরতা দেখিয়া অর্জ্জুন তাঁহার প্রবোধার্থ এই বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন,—"দেবি! আমি এখনি তোমাকে সেই নৃশংসের পাপমুণ্ড আনিয়া দিতেছি, তাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি স্নান করিলে তাহার পাপকার্য্যের কথঞ্চিৎ পরিশোধ হইবে।" তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তিনি অশ্বত্থামাকে আবদ্ধ করিয়া আনিয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে উপনীত করিয়া দিলেন। সেই পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তাঁহার পঞ্চশিশুহন্তাকে দেখিয়া কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে :—

"সুশোভনা দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে পশুর ন্যায় সেইরূপ রজ্জুবদ্ধ, নিজ পাপকার্য্য হেতু লজ্জায় অবনতমস্তক এবং অপমানসহকারে

আনীত দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন, এবং তাঁহার রজ্জুবন্ধন দেখিতে না পারিয়া ভর্ত্তাকে কহিলেন,—'নাথ এ ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করুন। ইনি আমাদের গুরু। যাঁহার নিকট আপনি গূঢ়মন্ত্র এবং ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া রণকৌশল লাভ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ দ্রোণ এই পুত্ররূপে সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার শরীরার্দ্ধ কৃপীও অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছেন; সাধ্বী বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর সহগমন করেন নাই। মহাত্মন্! গুরুকুলের অপকার করা আপনাদিগের উচিত নহে। প্রত্যুত, তাহার পূজা ও বন্দনা করাই উচিত। নাথ! গৌতমনন্দিনী পুত্রশোকপীড়িতা হইয়া যেন আমার ন্যায় অশ্রু-ত্যাগ না করেন! যদি কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণকুলের অপমান করেন, তাহা হইলে, তিনি সপরি-বারে নিরন্তর বিষম শোকানলে বিদগ্ধ হইতে থাকেন'।"

পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীর এত দূর ক্ষমা, এত দূর ধর্ম্মানুরাগ দেখিলে কাহার চিত্ত না মোহিত হয়! এই অমানুষী সহৃদয়তা, ক্ষমা ও ধর্ম্মানুরাগের চিত্র নিশ্চয়ই অশ্বত্থামার ঘোর বীভৎস চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলে, এবং চিত্তকে এত উদারতায় পূর্ণ করে, এত শান্তরসে আর্দ্র করে, এত ধর্ম্মানুরাগে অনুরক্ত করে যে, সেই পাপচিত্রের স্মৃতি যেন মন হইতে অপনীত হয়, এবং ধর্ম্মের প্রভূত বল—যে বলে দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে দেখিবামাত্র উত্তেজিত হইলেন, শোক তাপ সব দূরে গেল, সেই বল অন্তরে অন্তরে অনুভূত হইতে থাকে।

সাহিত্যে রসের ক্ষেত্র।

ট্র্যাজিডির উচ্চতা ভয়ানক এবং করুণ রসে। কিন্তু, ট্র্যাজিডির পরিণামে খুন ঘটাতে বীভৎস রসের ঘোর সঞ্চারে কি ভয়ানক, কি করুণ, উভয়কে মন্দীভূত করে। স্বচক্ষে খুন দেখিলে, কি খুনের নাম শুনিলে, কি স্মৃতিপথে খুনের উদয় হইলেই, অমনি বীভৎসের সঞ্চার হয়, শরীর শিহরিয়া উঠে, এবং হৃদয় কম্পিত হয়। সেই ভাব একেবারে তিরোহিত না হইলে আর অনুকম্পার উদয় হয় না। অনুকম্পা কাহার জন্য হয়? যে ব্যক্তি খুন হয়, সর্ব্বস্থলে যে তাহার প্রতি অনুকম্পা হয়, এমত নহে। একটি প্রকৃত ঘটনা লইয়া দেখ, "নবীন এলোকেশীর" খুনে পাপীয়সী এলোকেশীর প্রতি সাধারণ লোকের অনুকম্পার উদয় হয় নাই, নবীনই অনুকম্পার ভাগী হইয়াছিল। তদ্রূপ, "হ্যামলেট" নাটকে খুনকারী ছোট হ্যামলেটের প্রতিই অনুকম্পার উদয় হয়। লর্ড ম্যাক্‌বেথ্ নিহত হইলে কি তাহার নিমিত্ত তত অনুকম্পা হয়, না কীচক ও দুঃশাসন বধে তাহাদের প্রতি অনুকম্পার সঞ্চার হয়? কিন্তু যেখানে ধর্ম্মপক্ষ নিগৃহীত বা নিহত হয়, সেইখানেই সেই নিগৃহীত ও নিহত ব্যক্তি অনুকম্পা-ভাজন হন। সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলা, কৌশল্যা কুন্তী, উত্তরা, পঞ্চপাণ্ডব, ডেস্‌ডিমোনা, কিং লিয়র, কনষ্ট্যান্স, অফেলিয়া প্রভৃতি এ কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত। কিন্তু ট্র্যাজিডির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে তদধিক আর কিছু হয় না। ট্র্যাজিডি পাপের ঘোর নরককুণ্ড এবং পাপ ক্রমে ক্রমে কেমন ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা দেখাইবার যেমন প্রকৃষ্ট উপায়, বিভিন্ন অবস্থায়

পুণ্যের জ্যোতিঃ কেমন ক্রমশঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিবার তেমন উপায় নহে। "কিং লিয়রে"ও তাহা ঘটে নাই। রাজা নিগৃহীত হইয়া কেবল মাত্র অনুকম্পা-ভাজন হইয়াছেন। এক দিকে কর্ডেলিয়া, অন্য দিকে অপর দুই কন্যার চরিত্র এবং সংসারের গতি বিলক্ষণ বিকাশ করিয়া দেখাইবার নিমিত্তই যেন রাজার নাটক-মধ্যে সমাবেশ। যেরূপে রামচন্দ্র এবং যুধিষ্টিরের চরিত্র নানাবিধ দুরবস্থায় দলে দলে পদ্মফুলের মত প্রকাশিত হইয়াছে, ক্রমে ক্রমে সেই চরিত্রের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, এবং এক মহান্ ধর্ম্মাদর্শের সৃষ্টি হইয়া শান্তরসের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যেমন আর্য্যসাহিত্যের অন্তর্গত মহাকাব্যের প্রকাণ্ড প্রসারে সম্ভাবিত হইয়াছে, এমত আর কিছুতেই হয় নাই। "শকুন্তলায়" দুষ্মন্তচরিত্রে যে ধর্ম্মভাব বিদ্যমান, তাহা যুধিষ্ঠির কিম্বা রামের উচ্চতায় উঠে নাই। সেক্‌স্‌পিয়ারের ট্র্যাজিডির কথা দূরে থাক্, তাহার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে ত এ কথা মূলেই সম্ভাবিত নহে; এমন কি, বিলাতী, ল্যাটিন্ এবং গ্রীক্ মহাকাব্যে কি সেরূপ চরিত্রের বিকাশ দেখা যায়? তাহাতে শৌর্য্য বীর্য্যের বিকাশ আছে বটে, কিন্তু যুধিষ্ঠির এবং রামের মত তেমন ধর্ম্মবীরত্বের প্রকাণ্ড মূর্ত্তির সৃষ্টি কই? রাম এবং যুধিষ্ঠির মানবের কল্পনাকে একেবারে জুড়িয়া বসে;—যেন সেখানে আর কিছুরই সমাবেশ হইবার যো নাই। তাঁহারা কি কেবল লোকের অনুকম্পাভাজন, না ধর্ম্মবীরের প্রকাণ্ড চিত্র? তাঁহাদের সেই সমগ্রকল্পনাবিস্তৃত চরিত্র দর্শনে এত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়, পাঠকের মনে এত শান্তরসের সঞ্চার হয় যে, তাহাতে অনুকম্পা আর স্থান পায় না।

অনুকম্পায় ডেস্‌ডিমোনা উদ্ভাসিতা। রাজা লিয়র এত কষ্ট-ভোগ করিয়াছেন যে, তাঁহার দুরবস্থায় কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। কনষ্ট্যান্স পুত্রশোকে পাগলিনী, যেমন পাগলিনী পতি-বিয়োগবিধুরা উত্তরা। তাহারা সকলেই পরকে কাঁদাইয়া বড় হইয়াছে। তাহারা নিজে কাঁদিয়া পরকে কাঁদাইয়াছে। কিন্তু সেই পর্য্যন্তই শেষ। ট্র্যাজিডির ঘোর অন্ধকারক্ষেত্রে ডেস্‌ডি-মোনা একটি ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। দিনদেবের প্রখর জ্যোতিঃ যখন রাহুগ্রস্থ হয়, যখন সেই রাহুর ছায়াপাতে দিবসের মুখ ম্লান হয়; দিবা দ্বিপ্রহর যখন তমসাচ্ছন্ন, তখন যেমন একটি ক্ষুদ্র তারকার সামান্য জ্যোতিঃ দেখা যায়, ডেস্‌ডিমোনা সেইরূপ একটি নক্ষত্র। নাটকের কৃষ্ণতায় তাহার শ্বেতচিহ্ন একটু ফুটিয়াছে। অনুকম্পা সেই চিহ্নকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। ট্র্যাজিডির কার্য্যই এইরূপ। ট্র্যাজিডি পাপছবির ঘোর অন্ধকারে ধর্ম্মের একটু জ্যোৎস্না ফুটাইতে চাহে। কিন্তু ধর্ম্মের সম্যক্‌ ছবি ও তেজ তাহাতে দেখা যায় না। ট্র্যাজিডি একাধারে তত স্থান পায় না। ধর্ম্মের ঈষ-দাভাস ব্যতীত তাহার মুখ সম্যক্‌ বিকাশ করিয়া দেখাইতে গেলে, ট্র্যাজিডির রসভঙ্গ ঘটে। ভয়ানকই তাহার প্রধান রস, করুণা তাহার পরিণাম। সেই রসে ধর্ম্ম যত দূর ফুটে, তত দূর পর্য্যন্তই তাহার সীমা। সে সীমা অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মকে অধিকতর ফুটাইতে গেলে শান্তিরসের আবির্ভাব ঘটে; আর ট্র্যাজিক রস থাকে না। এ জন্য ট্র্যাজিডি শান্তিরসকে প্রবল করিতে পারে না। শান্তিরস প্রবল হইয়াছে—আর্য্যসাহিত্যে, নাটকে ও মহাকাব্যে। সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ সম্যক্‌ বিকীর্ণ হইয়াছে।

সাহিত্যে বীরত্ব।

ট্র্যাজিডিতে পাপচিত্র যেমন ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ়তা লাভ করিয়াছে,—পাপের গতি ক্রমে ক্রমে যেমন উচ্চতায় উঠিয়াছে, আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্ম তদ্রূপ। আর্য্যসাহিত্যে ধর্ম্মের বীরত্ব। মিল্টনে যেমন পাপের বীরত্ব ও জয়, আর্য্যমহাকাব্যে তেমনি ধর্ম্মের বীরত্ব ও জয়। সেই বীরত্বকে সম্যক্‌রূপে ফুটাইবার জন্য, তাহার পার্শ্বে আর দ্বিবিধ বীরত্বের বিরাট বিকাশ আছে। এক বীরত্ব ভীমের শারীরিক বলবীর্য্য, অন্য বীরত্ব অর্জ্জুনের শৌর্য্য ও সামরিক বীরত্ব। ভীমের মহাশক্তি দুর্য্যোধনে ছিল বলিয়া, দুর্য্যোধন ভীমের প্রতিযোগী। ভীমের বীরত্ব ধর্ম্মাধীন, দুর্য্যোধনের বীরত্ব তাহা নহে। সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতিযোগী কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিযোগী দ্রোণ। কর্ণের আসুরিক বীরত্বের প্রতিযোগী ঘটোৎকচ। ভীষ্মের প্রতিযোগী সমস্ত পাণ্ডববীর, যেমন অভিমন্যুর প্রতিযোগী সমস্ত কুরুবীর। কিন্তু ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতিযোগী কে? তিনি অর্জ্জুনের বা ভীমের বীরত্বে প্রধান নহেন। সে বীরত্ব দেখাইতে গিয়া তিনি কর্ণের কাছে অপ্রতিভ হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বীরত্বে প্রধান, সে বীরত্বের উচ্চতায় অর্জ্জুন, ভীম, সকলেই অবনত। অবনত বলিয়া ভীম ও অর্জ্জুনের গৌরব এবং সামরিক বীরত্ব হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-বীরত্বের পার্থক্য। সেই ধর্ম্মবীরত্বের উচ্চতা কুরুপক্ষে কেবল বিদুর ও ভীষ্মদেবে ছিল; পাপপক্ষে তাঁহাদের বীরত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মতেজ কেমন ক্রমশঃই উচ্চতায় উঠিয়াছে, তাহা পাণ্ডবপক্ষে প্রতীয়মান। ধর্ম্মের এই প্রশান্ত আদর্শ আর্য্যসাহিত্যে। আর আদর্শ শ্রীকৃষ্ণে। শ্রীকৃষ্ণের

মহান্ চরিত্রের আলোচনায় প্রতীত হয়, পাপাপক্ষের বল ও কৌশল যত কেন শ্রেষ্ঠতা লাভ করুক না, তাহা দৈববল ও কৌশলের নিকট একেবারে পরাভূত। দৈববল সর্ব্বোচ্চ বল, দেবপক্ষই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পক্ষ। দেববীর্য্য মানবীয় সর্ব্ববিধ বীর্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পার্থিব সকল বলের উপর দৈববল বিজয়ী। ধর্ম্ম অবশ্য দৈববলের আশ্রিত, সেই দৈবাশ্রিত ধর্ম্মপক্ষের সমকক্ষ কি পাপপ্রবণ ও পার্থিব বলে বলীয়ান কুরুপক্ষ হইতে পারে? কুরুপক্ষে ধর্ম্মের বীরত্ব ছিল না, সুতরাং দেবপক্ষেরও সহায়তা ছিল না; এই নিমিত্ত তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইল।

সাহিত্যে দেবত্ব।

মহাভারতের নায়ক কে? ভীম কি ভারতের নায়ক?—না, ভীম যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শাসিত; অর্জ্জুনও তদ্রূপ; নিজে যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণাধীন। তবে ধরিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণই ভারতের নায়ক। যিনি বিশ্বরাজ ও ব্রহ্মাণ্ডপতি, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমৎরূপে প্রতীয়মান, তিনি ভারতেও সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। ভারতক্ষেত্রে তিনি ধনুর্ধারী হয়েন নাই বটে, কিন্তু সর্ব্বঘটে ও সর্ব্বস্থানেই তাঁহার শক্তি ও কৌশল অখণ্ডনীয় এবং বিজয়ী। সহস্র সহস্র নারায়ণী সেনা এক নারায়ণের সমতুল্য নহে। সমস্ত কুরুবীর তাঁহার কৌশলশক্তিতে পরাভূত। মহাভারত মধ্যে যেমন পদে পদে তাঁহাকে অনুভব করা যায়, মিল্টনের মহাকাব্যে কি সেরূপ হয়? তথায় ভগবান্ নির্জীব ও অদৃশ্য। তিনি তেমনই নির্জীব, যেমন রামচন্দ্র মাইকেলের

"মেঘনাদবধে"। কিন্তু এই রামচন্দ্র রামায়ণের মহাকাব্যে কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন ?

মহাভারতে যে পর্ব্ব, রামায়ণেও সেই কাণ্ড। প্রভেদ এই, রামায়ণে এক রামচন্দ্রে সকল বীরত্ব একত্রীভূত ; মহাভারতে যাহা ভীমের বল, অর্জ্জুনের বীরত্ব এবং যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মগৌরব, সে সমস্তই একাধারে রামচন্দ্রে সমাবিষ্ট। তিনি তদপেক্ষাও অধিক। রামচন্দ্রে শুধু যে বল, বীর্য্য ও ধর্ম্ম, এমত নহে ; তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের দৈবশক্তিও দেদীপ্যমান। এই রামচন্দ্রের প্রভূত শক্তিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ব্যাস কৃষ্ণসহায় পাণ্ডবপক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। রামচন্দ্র রামায়ণের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার মূর্ত্তি যেমন উজ্জ্বল, তেমন উজ্জ্বল রামায়ণে আর কে ? বাল্মীকি সেই রামচন্দ্রে সমস্ত বলবীর্য্য ও শক্তি নিহিত করিয়া দিয়া, আবার সে সমুদায় একে একে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। যে ত্রিবিধ বীরত্ব ভারতের ভীমার্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরে, সেই ত্রিবিধ বীরত্ব রাম, লক্ষ্মণ ও হনুমানে। রামে একদা সর্ব্ববিধ বীরত্ব ;—আবার লক্ষ্মণ ও হনুমানের পার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্মবীরত্ব অধিকতর জাজ্বল্যমান। ধনুর্ভঙ্গপণে ও অসুরনাশনে তাঁহার ভীমের বীরত্ব সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। ভার্গববিজয়ে ও রামরাবণের যুদ্ধকালে, তাঁহার অসামান্য শৌর্য্য ও সামরিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। অথচ তিনি ধর্ম্মবীরত্বে লক্ষ্মণ এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রের বীরত্বের পরিচয় অযোধ্যা হইতে তাঁহার বনগমনকালে যেমন, বনে বনে আশ্রমবাসী ঋষিগণের কাছে, সুগ্রীবপক্ষীয় বানর জাতির কাছে এবং রাক্ষসকুলের কাছেও তেমনি। সেই বীরত্বে সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান, এবং রাক্ষস-

পক্ষীয় মারীচ প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মপ্রবণ রাক্ষসকুলও অবনত। মন্দোদরী বারম্বার রাবণকে সন্ধিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। কেন করেন? কেবল কি রামকে মহাবীর জানিয়া সকলে রামের বিক্রমে ভীত হইয়াছিলেন? তদপেক্ষা অন্য এক বিক্রম রামচন্দ্রে ছিল। সে বিক্রম তাঁহার দৈববল। যে বলের তেজ রামচন্দ্রে ছিল, সেই দৈববলের বিক্রম অনুভব করিয়া মন্দোদরী পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন,—

"আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, রাম জন্ম বৃদ্ধি ও নিধনবিহীন সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বান্তর্যামী প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক সৃষ্টিকর্ত্তা পরমপুরুষ সনাতনই হইবেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসশোভিত, সেই ক্ষয়রহিত, পরিমাণশূন্য, সত্যপরাক্রম, অজেয়, সর্ব্বলোকেশ্বর শ্রীমান্ মহাদ্যুতি লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুই লোক সকলের হিতকামনায় মানুষরূপ ধারণ করিয়া বানররূপাপন্ন দেবগণের সহিত ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষস পরিবারগণের সহিত মহাবল মহাবীর্য্য ভয়াবহ দেবশত্রু রাক্ষসরাজকে বধ করিয়াছেন।"—লঙ্কাকাণ্ড—১১৩ অধ্যায়।

তবেই, এক রামচন্দ্রে বাল্মীকি, সমগ্র পার্থিব বল দৈববলের সহিত নিহিত করিয়া, তাঁহাকে এক অদ্বিতীয় বীররূপে সৃষ্টি কয়িয়াছিলেন। সে সৃষ্টির বিশ্লেষণ—শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মপুত্র, অর্জ্জুন ও ভীম। এ এক অপূর্ব্ব মহান্ সৃষ্টি, সমুদায় বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড ও পরমেশ্বরের বল একাধারে সন্নিবিষ্ট। তত বড় মহাকল্পনা আর কি হইতে পারে? ট্র্যাজিডি এত উচ্চতায় কি উঠিতে পারে? ধর্ম্মের এত উচ্চ গৌরবে, ট্র্যাজিডির উপনীত হওয়া অসম্ভব। বিলাতী আসুরিক ও পার্থিব বলবীর্য্যপূর্ণ-কল্পনাসমন্বিত মিল্টন কখন সে উচ্চতায় যাইতে পারেন নাই। তিনি শিব গড়িতে গিয়া তাঁহার মহাকাব্যে ভয়ানক অসুরের সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীক এবং লাটিন মহাকাব্যেও পার্থিব বল ও আসুরিক বীর্য্য। অন্যদেশীয় মহাকাব্যে এই বাল্মীকির সৃষ্টি ও সুরসৌন্দর্য্য কোথায়! এই ধর্ম্মাদর্শ,

বীরত্বসৃষ্টি ও সুরশোভাবিকাশের বিস্তারিত লীলাক্ষেত্র রামায়ণ ও মহাভারত। আর্য্যকবিগণ সেই মহাকাব্যের মহাসাগর হইতে বারি আহরণ করিয়া এক এক ক্ষুদ্র কাব্যের সৃষ্টি করিয়া ভূলোকে মন্দাকিনীর স্বর্গস্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। সেই স্রোতে অবগাহন করিলে লোক স্নিগ্ধ হয় ও অমৃতাস্বাদন করে। সে অমরসুধা কি আর কোন জাতির সাহিত্যে পাওয়া যায়? তাহা কেবল ভারতের অমূল্য নিধি, অপূর্ব্ব সৃষ্টি ও দিব্য সৌন্দর্য্য। তাহার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে জগৎ মোহিত!

সাহিত্যে খুন।

খুন সম্বন্ধে আলঙ্কারিকের মত।

সকলেই, বোধ হয়, জানেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। যাহার শ্রবণ এবং অধ্যয়ন পর্য্যন্তই শেষ হয়, তাহাকে শ্রব্য কাব্য বলে, এবং যাহার সেই পর্য্যন্তই শেষ নহে, যাহাকে অভিনয়ে পরিণত এবং জীবনদান করিয়া কাব্যকল্পনাকে কার্য্যে এবং ব্যবহারে আবার প্রতিফলিত এবং দশ জনের চক্ষুর সমক্ষে প্রদর্শিত করা হয়, তাহাকেই দৃশ্য কাব্য কহে। এজন্য দৃশ্য-কাব্যের অন্যতর নাম রূপক—যাহাতে কাব্যে রূপ আরোপিত করে, তাহাই রূপক। বিশ্বনাথ কাব্যের লক্ষণ সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।"

রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য। যাহা দ্বারা মনের প্রীতি ও আনন্দ না জন্মে, তাহা রসই নহে। সহৃদয় জনগণের চিত্তে করুণাদি স্থায়ী ভাব, বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আনন্দজনক হইলে, তাহাকেই রস বলে। কাব্যশরীরকে এরূপে গড়িতে হইবে, যদ্দ্বারা সহৃদয় লোকের চিত্তে আনন্দ জন্মিতে পারে, এবং সেই কাব্য অধীত বা অভিনীত হইলে কোন বিশেষপ্রকার ফলোদয় ঘটে। যদ্দ্বরা কোন বিশেষ প্রকার ফলোদয় না ঘটে, তাহা কাব্যই নহে। দণ্ডী কাব্যশরীরের এইরূপ লক্ষণ দেন :—

"শরীরং তাবদিষ্টার্থব্যবচ্ছিন্না পদাবলী।"

যে পদাবলীর কোন বিশেষ ইষ্টার্থ আছে, তদ্দ্বারা কাব্য-শরীর গঠিত হয়। ইষ্টার্থ কি ? না

"সহৃদয়বেদ্যোঽর্থঃ।"

তবেই দেখা যাইতেছে, কাব্য প্রীতিপ্রদ হওয়া চাই, এবং তদ্দ্বারা কোন ইষ্টার্থসাধন (desired effect) চাই। কাহাদের ইষ্টার্থ ?—সহৃদয় জনগণের। যাঁহারা সুরুচিসম্পন্ন এবং কাব্যের রসাস্বাদনে সমর্থ, এরূপ লোককেই সহৃদয় বলা যাইতে পারে। শ্রব্য কাব্যই হউক, বা দৃশ্য কাব্যই হউক, সকল কাব্যই উক্তরূপ রসাত্মক হওয়া চাই। লোকের রুচি নানাবিধ হওয়াতে, শ্রব্য কাব্য নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। শ্রব্য কাব্য কেবল অধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্রেই শেষ হয় বলিয়া, তাহাতে সুরুচিকে বজায় রাখিয়া যত দূর স্বাধীনতা চলে, দৃশ্য কাব্যে তত দূর চলে না ; যেহেতু দৃশ্যকাব্যকে আবার অভিনয়ে জীবিতমূর্ত্তিতে দেখাইতে হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য-বিপ্লব, মারামারি, কাটাকাটী, রক্তারক্তি প্রভৃতি শ্রব্য কাব্যে চলিতে পারে, কিন্তু দৃশ্য কাব্যে তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া অভিনয়ে দেখাইতে হইলে, তাহা সহৃদয়জনগণের প্রীতিপ্রদ না হইতে পারে। এজন্য দৃশ্য কাব্যের নিয়মাদি অনেকপরিমাণে আরও বিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে।

কেবলমাত্র পড়িয়া যাহাতে আনন্দলাভ করা যায়, বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে অভিনয় দ্বারা তাহাকে মূর্ত্তিমান করিলে হয় ত তদ্দ্বারা তত দূর আনন্দ না জন্মিতে পারে। যাহাতে সেই আনন্দের ব্যাঘাত হয়, নাটককারগণ তাহা অতি সাবধানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যাহা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, যাহা সহৃদয় জনগণের রুচির প্রতিবিরোধী হয়, যাহা বাহ্যদৃশ্যে ও ব্যবহারে লজ্জাকর, এমন

সকল অনুষ্ঠান কাজেই দৃশ্যকাব্যে সংযোজিত হইতে পারে না। এজন্য সাহিত্যদর্পণ-কার বলিতেছেন :—

"দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥
দন্তচ্ছেদ্যং নখচ্ছেদ্যমন্যদ্ ব্রীড়াকরঞ্চ যৎ।
শয়নাধরপানাদি নগরাদ্যুপরোধনম্॥
স্নানানুলেপনে চৈভির্বর্জ্জিতো নাতিবিস্তর:।"

নাটকে কি কি পরিবর্জ্জনীয়, আলঙ্কারিক তাহা বলিতেছেন—দূরাহ্বান, বধ, যুদ্ধ, রাজ্যদেশাদিবিপ্লব, বিবাহ, ভোজন, শাপ, উৎসর্গ, মৃত্যু, রতি, দন্তচ্ছেদ, এবং নখচ্ছেদ প্রভৃতি ব্রীড়াকর ব্যাপার, শয়ন এবং অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ (Blockade) এবং স্নান ও শরীরে অনুলেপন।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের আলঙ্কারিকেরা নাটকে হত্যাব্যাপার নিষিদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন। কারণ, বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে হত্যাব্যাপারে লোকের প্রীতি উৎপাদন করা দূরে থাক, তদ্দ্বারা সহৃদয় জনগণের মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হয়, এবং সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে। হত্যাকাণ্ড কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে কাহারও ভাল লাগে না। সময়ে সময়ে তদ্দ্বারা অসহ্য ক্রোধসঞ্চারেরও সম্ভাবনা। সেরূপ ক্রোধোদ্রেক হইলে লোকে এত দূর উত্তেজিত হইতে পারে যে, রঙ্গভূমে হয় ত শ্রোতৃবর্গ সেই অভিনীত হত্যাকাণ্ডের উপর আর একটা হত্যাকাণ্ড বাঁধাইতে পারেন। রক্তমাংসশরীরে এরূপ একটি হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া স্থিরভাবে বসিয়া কে সহ্য করিতে পারে?—

Desdemona. O, Banish me, my lord, but kill me not.

Othello. Down, Strumpet!

Des. Kill me to-morrow, let me live to-night.

Oth. Nay if you strive,—

Des. But half an hour.

Oth. Being done,

There is no pause.

Des. But while I say one prayer.

Oth. It is too late. (He smothers her.)

রঙ্গভূমিতে খুন-দর্শনের অনিষ্ট।

এ দৃশ্য কখন ঘটিতেছে, যখন সমস্ত শ্রোতৃবর্গ বিলক্ষণ জানিয়াছেন, ডেস্‌ডিমোনার কোন দোষ নাই। সেই নিরপরাধা সরলা, বিশুদ্ধপ্রেমপ্রাণা পতিপরায়ণা কেবল মূর্খ ও নির্ব্বোধ পতির সন্দেহাগ্নিতে পতিতা হইয়াছেন। পতি, সেই সন্দেহাগ্নিতে কোপান্বিত হইয়া অনর্থক সেই সরলাকে হত্যা করিতেছেন। কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি স্বচক্ষে এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন? তাঁহারও কি কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হয় না? তিনিও কি রঙ্গভূমিতে দৌড়িয়া গিয়া, ওথেলোকে নিরতিশয় প্রহার দিয়া গায়ের রাগ মিটাইতে যাইবেন না? তাহা হইলেই রঙ্গভূমিতে আর এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত হয়। একজন প্রতারিত বুদ্ধিহীন মুরের মত লোকের প্রতি কিছু এত সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না যে, নিতান্ত নিরপরাধা স্ত্রীর হত্যা তাহার সহ্য হইবে। কোন ঘোর মহাপাতকীর খুন হইলে তবু লোক বলিতে পারে, কি হইবে? রাগের মাথায় হইয়া

গিয়াছে। তথাপি স্ত্রীহত্যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। পাপীয়সী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। গোঁয়ার লোকের প্রতি কাহার দয়ার সঞ্চার হইতে পারে? হিন্দুর চক্ষে যে আদর্শ রহিয়াছে, প্রকৃত সহৃদয় হিন্দুর যাহা রুচি হওয়া উচিত, হিন্দু সমাজের এবং হিন্দু ধর্ম্মের যাহা বিধান, স্ত্রীহত্যা তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। আবার সেই স্ত্রীকে যখন নিরপরাধা বলিয়া বিলক্ষণ জানা যাইতেছে, তখন তাহার হত্যা কোন্ হিন্দু পড়িতে বা দেখিতে পারেন? দেখিলে, সহ্য করিতে পারেন? সেরূপ স্ত্রীহত্যা দেখাতে কি মনের মলিনতা জন্মে না, অন্তরে পাপস্পর্শ হয় না? সুতরাং তাহা দেখাতেও পাতক আছে।

হিন্দু আদর্শ।

প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে এই স্ত্রীহত্যার অভিনয় প্রদর্শন করা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। রঙ্গভূমিতেই তদ্দ্বারা যে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহাও আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। পাছে হত্যাদর্শনের পাপ লোকের কল্পনাকে মলিন করে, তাই আমাদের নাটককারগণ কোনখানে এরূপ হত্যাব্যাপার প্রদর্শন করেন নাই। আমাদের নব নাটকে এরূপ একটিও দৃশ্য নাই। বাস্তবিক যাহা ইউরোপে Tragedy বলিয়া বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ, তাহা হিন্দু ধর্ম্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত হইয়াছে। সেই ট্র্যাজিডি এ দেশে আসাতে কি অনর্থই না ঘটিয়াছে।

ইউরোপীয় ট্র্যাজিডির উৎপত্তি ও প্রকৃতি।

আমাদের দেশে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে যেরূপ উচ্চ আদর্শ পাওয়া যায়, তাহা হিন্দু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুমোদনীয়। হিন্দুর রুচি এবং হিন্দুর হৃদয়ের সহিত তাহা মেলে। ইউরোপ সে আদর্শ কোথায় পাইবে? আমরা সাহিত্যদর্পণ হইতে নাটকের যে নিষেধবিধি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আমাদের নাটকীয় আদর্শ সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ইউরোপে নাটকীয় আদর্শ গ্রীস হইতে প্রথমে গৃহীত হয়। তৎপরে তাহার বিবিধ ব্যতিক্রম করা হয়। নানা ইউরোপীয় জাতির রুচি অনুসারে এই সকল ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। কিন্তু কি গ্রীক জাতি, কি অপরাপর ইউরো-পীয় জাতি, কোন জাতিরই ধর্ম্মাদর্শ হিন্দুর মত নহে, সুতরাং তাহাদের রুচিরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল। এইজন্য ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য কোনকালে হিন্দু নাট্যসাহিত্যের আদর্শে উঠিতে পারে নাই। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যেরূপ রুধিরপ্রিয়, যেরূপ কঠিনস্বভাব, তাহাদের নাটকীয় আদর্শে তাহা প্রতিফলিত হই-য়াছে। স্পার্টার নিয়মাদি কিরূপ নিষ্ঠুর ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীস ইতিহাসের পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে। এথিনীয়েরা দেশের অনেক বড় বড় ভদ্র ও দেশহিতৈষী লোককে নির্দ্দয়রূপে নিপীড়ন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা সক্রেটিসকে তাঁহারা এক রকম বিষপানে বধ করিয়াছিলেন। সেই মহাজনের বিষপান তাহারা স্বচ্ছন্দে দেখিয়াছিল। ক্ষমা বুঝি তাহারা জানিত না। দেশের বিধানশাস্ত্রং অতি নির্দ্দয় করিয়া রাখিয়াছিল। সেই নির্ম্মম ও

নির্দ্দয় দেশ হইতে ট্র্যাজিডির উদ্ভব। সে ট্র্যাজিডি যে রক্তারক্তি ও নির্দ্দয় ব্যবহারে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

আর যাঁহারা এই ট্র্যাজিডি গ্রীক সাহিত্য হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই অপরাপর ইউরোপীয় জাতিগণ কিরূপ ছিলেন? আমি বার বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্য-দর্শনে" যাহা লিখিয়াছিলাম, আজি তাহা আর একবার আবৃত্তি করি :—

"অতি প্রাচীন কালে সেই যে ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ব্বর জাতিসমূহ অত্যন্ত নির্দ্দয়স্বভাব ছিল, আজিও যেন তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত আধুনিক জাতিমধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ নৃশংসাচরণে যেরূপ আমোদ প্রাপ্ত হইত, সে আমোদ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। স্পার্টানগণের নৃশংসাচরণ, রোমানদিগের গ্লাডিয়েটরের ক্রীড়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। মধ্যযুগের ইতিহাস নররুধিরে কি ভয়ঙ্কররূপে প্লাবিত রহিয়াছে! ক্রুসেডের রক্তপাত, ইন্‌কুইজিসনের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আবার দেখ, ইহুদিজাতির প্রতি উৎপীড়ন, উইচক্রাফ্‌টের শাস্তির বিবরণে যে প্রকার নৃশংসাচরণের পরিচয় হয়, কোন্ জাতির ইতিবৃত্তে তত ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত আছে? আবার ঐ কি? আয়র্লণ্ডের ঘোর ইতিবৃত্ত—ইংরাজগণ ও স্কট্‌গণের ঘোর হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সের প্রটেস্‌টাণ্ট এবং ক্যাথলিকগণের হত্যাকাণ্ড! এ সমস্ত পড়িলে আর কি ইউরোপীয়গণকে সভ্যজাতি বলা যায়? স্পেন আমেরিকা-জয়ের সঙ্গে কি অধমতম বর্ব্বরতারই পরিচয় না দিয়াছে? ইউরোপীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র পর্য্যালোচন করিয়া দেখ, তাহাদিগের পূর্ব্বকালের

দণ্ডবিধান কেমন রুধিরের লোহিত বর্ণে অঙ্কিত ছিল। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইতে থাকে যেন, ইউরোপীয়-গণের প্রকৃতিই কেমন নৃশংস উপকরণে গঠিত। তাহা কিছুতেই নরম করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে এত উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করা হয়, তাহাও ইউরোপে ব্যর্থ হইয়াছে, ইউরোপীয় জাতি-নিচয়ের নৃশংসতার অপনয়ন করিতে পারে নাই।” কারণ:—
What is bred in the bone, cannot come out of the flesh.

“ইউরোপীয় জাতির উল্লিখিত প্রকৃতিমূলক দোষ শুদ্ধ যে তাহাদিগের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে এমত নহে, তাহা-দিগের সেই বর্ব্বর স্বভাব তদীয় সাহিত্যের এক প্রধান ভাগকেও দূষিত করিয়াছে। তাহাদিগের নাট্যরচনায় তাহা ট্র্যাজিডির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাজিডি শুদ্ধ ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্পত্তি। তাহা সেই সাহিত্যের গৌরব কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয়।”

ট্র্যাজিডি-পাঠের কুফল।

বর্ব্বরস্বভাব এবং রক্তপ্রিয় অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণ গ্রীক ট্র্যাজিডিকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রকৃতি ও রুচি ট্র্যাজিডির বিষম পরিণামে আনন্দলাভ করিত। তাই ইংরাজী সাহিত্যেও এই ট্র্যাজিডি অনায়াসে প্রবেশলাভ করিয়াছে। সেক্সপিয়ারের অতুল্য প্রতিভা ট্র্যাজিডির আনন্দে

মাতিয়াছিল। তাঁহার রুচি এমন পরিশুদ্ধ হয় নাই যে, সেই ট্র্যাজিডির দোষ দর্শন করিয়া তাহা পরিবর্জ্জন করে। তিনি তাঁহার সমস্ত গুণপনা ও কবিত্বশক্তি সেই ট্র্যাজিডির মধ্যে নিবেশিত করিয়াছেন। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমস্ত সুতরাং জগতের এক অতুল্য পদার্থ হইয়া পড়িয়াছে। লোকে সেক্সপিয়ারের প্রতিভাসমুৎপন্ন কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিতেছে। আজি আমরাও সেক্সপিয়ারের পাঠক, পাঠক কি? তাঁহাকে পূজা করিতেছি, তাঁহার কবিত্বের স্বর্ণময় নল দিয়া বিষপান করিতেছি। কালিদাস যে সাহিত্যের সিংহাসনে বসিয়া তাহা শত শোভায় শোভিত করিয়াছেন, এবং শত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সে সাহিত্যে আজি আমাদের প্রবৃত্তি নাই। ব্যাস, বাল্মীকি অন্ধকারে বসিয়া কাঁদিতেছেন। ভবভূতির অলোক-সাধারণ "উত্তরচরিত" অবজ্ঞাত হইয়াছে। আমরা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, সুতরাং সেই সঙ্গে সেক্সপিয়ারের সমুদায় ট্র্যাজিডির সম্মান বাড়াইতেও শিখিতেছি। সেক্সপিয়ারের অসংখ্য সুনিপুণ সমালোচকগণ আমাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন; আমাদিগের সুকুমার রুচির বিকার সাধন করিয়া দিতেছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে আমরাও বাঁধিবুলি শিখিয়া কেবলই বলিতেছি, সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডিগুলি জগতের অতুল্য সম্পত্তি।

কেবল এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হই নাই, আমাদের নূতন রঙ্গভূমে সেক্সপিয়ারের ম্যাক্‌বেথের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। নাটক বলিলেই আমাদের নাটককারগণ অগ্রে ট্র্যাজিডি লিখিয়া বসেন। শুদ্ধ রঙ্গভূমে নহে, শুদ্ধ হাতেকলমে নহে, বাস্তবিকই আমরা এক এক সময়ে নিজে ট্র্যাজিডির অভিনয় করিয়া থাকি।

বিলাত হইতে এ দেশে নানাবিধ শাণিত অস্ত্র আসাতে তাহা সুলভ হইয়াছে, সেই শাণিত অস্ত্র লইয়া আমাদের কোন সরলা অপরাধিহীনা ললনা-রত্নকে ডেসডিমোনার মত নৃশংসরূপে হত্যা করিতেছি। আমাদের হত্যা ব্যাপারের দৃষ্টান্ত চারিদিকে প্রচারিত হইতেছে। শেষে কি ভদ্র কি ইতর, কি ইংরাজীওয়ালা কি নিরক্ষর মূর্খ, সবাই অস্ত্র চালাইতে মজবুত হইয়াছে, এবং ট্র্যাজিডির অভিনয় করিয়া রক্তগঙ্গায় দেশ প্লাবিত করিতেছে।

এরূপ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কারণ, ইংরেজী নাটকে, গল্পে, কাব্যে এবং সাহিত্যে বিশেষ আদর করিয়া আমরা নানাবিধ ট্র্যাজিডি পড়িতেছি। কল্পনায় খুন রাত্রি দিন রহিয়াছে। মনে মনে সর্ব্বদা যে খুন দেখে, খুনে তাহার আর ঘৃণা জন্মে না, পাপের অপবিত্রতা অপনীত হয়। বিশেষতঃ সাহিত্যে শিখি, যত বীর, যত বড় লোক, যত মান্য গণ্য লোক রক্তারক্তি করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। আমরাও সেইরূপ বীর হইতে চাই, বড়লোকের সেইরূপ কার্য্যের অনুগামী হইতে শিখি, এবং রক্তারক্তি ও খুন করিয়া পুরুষত্ব দেখাই। কল্পনায় পুরুষত্বের নূতন আদর্শ চিত্রিত দেখি। খুনে আমাদের নূতন অনুরাগ। ইউরোপীয় সমাজে সে অনুরাগ শিথিল হইয়া গিয়াছে।

আর্য্যসাহিত্য খুনহীন হইয়াও বিয়োগান্ত-রসে পূর্ণ।

এই ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে আমি তের বৎসর পূর্ব্বে "আর্য্যদর্শনে" যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম :—

"প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যে যদিও ইউরোপীয় বিয়োগান্ত * রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ, তাহা আর্য্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণ রস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ, তাহা আর্য্য সাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপিয়ারের ডেস্‌ডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, শকুন্তলা, সাগরিকা, মালবিকা, মহাশ্বেতা, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি কবিকল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিকপরিমাণে সন্তপ্ত হইয়া থাকি? অথচ তাঁহারা কেহই ডেস্‌ডিমোনার ন্যায় নৃশংসরূপে নিহত হয়েন নাই। বাল্মীকি মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কাব্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা, নিষ্পাপিনী ডেস্‌ডিমোনা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন; সীতা কবিকল্পিত স্বর্গরথে দেবতাগণের পুষ্পবৃষ্টি ও আনন্দধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু জন্মদুঃখিনী সীতার দুঃখ ও ক্লেশ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মানবহৃদয়ের সহানুভূতি-মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে।"

"সীতার দুঃখে কাতর হইয়া আমরা বাল্মীকির সহিত প্রতি ঘটনায়, প্রতি পত্রে কাঁদি, কাঁদিয়া হৃদয় কাতরতায় তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাঁহার হৃদয়মাধুরী শনৈঃ শনৈঃ আমাদের

---

* ট্র্যাজিডিকে বিয়োগান্ত বলিলে কিছুই বলা হইল না। বিয়োগ অনেক রকমে ঘটিতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজিডির বিয়োগ বিশেষ প্রকার; তাহাতে রক্তারক্তি, কাটাকাটি চাই। এ জন্য ট্র্যাজিডিকে বিয়োগান্ত বলিলে ঠিক অনুবাদ হইল না। অথচ সচরাচর লোকে বিয়োগান্ত শব্দই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হৃদয়ে জাগিতে থাকে, সীতার সকল গুণে পক্ষপাতী হই; সরমার সহিত অশোকবনে তাঁহার জন্য কাঁদিতে থাকি, বনবাসে লক্ষ্মণের সহিত অশ্রুপাতে ভাসাইয়া দিই। সীতা আমাদের মনোমন্দিরে অতি পবিত্র মূর্ত্তিতে চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েন। সীতা ভারতবাসিগণের হৃদয় বিগলিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবাসিগণ সীতার জন্য চিরকালই অশ্রুবর্ষণ করিবেন।"

ভবভূতি বা বাল্মীকির সহিত এখানে সেক্সপিয়ারের তুলনা হইতেছে না। আমরা জানি, সেক্সপিয়ারের অনেক গুণ আছে, যে জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইবার যোগ্যপাত্র। তিনিও এক জন উচ্চ দরের কবি। কিন্তু এখানে Tragic রসের বিচার হইতেছে; সন্তাপের স্থায়ী ফলের কথা হইতেছে। এ প্রস্তাব কবিত্বের বিচার নহে। তাহা স্বতন্ত্র কথা। সীতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, দময়ন্তী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। চিরদুঃখে তাঁহাদের পতিভক্তি পবিত্র হইয়া গিয়াছে। চিরদুঃখিনী হইয়া তাঁহারা জগজ্জনের হৃদয়মন্দির চিরদিনের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। নিহত না হইয়াও তাঁহাদের বিয়োগ জগতের নিকট চিরসন্তাপের কারণ হইয়াছে। সকলেই তাঁহাদের জন্য কাতর। তবে ত হত্যা ব্যতীতও সন্তাপ সমান স্থায়ী হইতে পারে?

খুনে বীভৎসের সঞ্চার।

সে যাহা হউক, অনেকে হয় তো বলিবেন, ডেস্‌ডিমোনার জন্য কি আমাদের হৃদয় কাঁদে না? হৃদয় কাঁদে বটে, কিন্তু হত্যাকাণ্ড দ্বারা নিহত হইলে যে অশ্রুপাত হয়, তাহার সহিত সীতার মত

বিয়োগ হেতু অশ্রুপাতের একটু স্বতন্ত্রতা আছে। আমরা ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

সেক্সপিয়ারে আমরা আইমজিন এবং ডেস্‌ডিমোনার মত পতিপরায়ণতা ও প্রেমের দৃষ্টান্ত অতি অল্পই দেখিতে পাই। ডেস্‌ডিমোনার প্রেম জুলিয়েটের মত 'বুক্‌চাপড়ানি' প্রেম নহে। তাহা অতি গভীর, অতি শান্ত ও হৃদয়ব্যাপী, অথচ তেমনই উগ্র উষ্ণ ও প্রবল। সে প্রেম চক্ষের নেশা নহে। সেই প্রেমভূষিতা ডেস্‌ডিমোনা সর্ব্বজনমনোহরা, তাঁহার হৃদয়মাধুরীতে তিনি সকলের মন হরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই চিত্র আঁকিয়াই সেক্সপিয়ার মুরের চরিত্র ফুটাইতে ফুটাইতে ডেস্‌ডিমোনার খুনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে বসিলেন। তার পর পাঠক ডেস্‌ডিমোনার খুনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্র ও ঘোর হত্যাব্যাপারে নিমগ্ন হইলেন। ডেস্‌ডিমোনা নির্দ্দয়রূপে নিহত হইলেন! কি বীভৎস ব্যাপার! ডেস্‌ডিমোনার সৃষ্টি কি কেবল এইরূপ ঘোর হত্যাব্যাপারের নিমিত্ত? তাহার হত্যা ব্যাপার দেখিয়া কি অশ্রুপাত হয়? না, শরীর শিহরিয়া উঠে? ডেস্‌ডিমোনার পর এমেলিয়া নিহত হইল। মনে হয়, সেই ছুরিকাঘাত যেন নিজ বক্ষে বিঁধিল। কি ভয়ানক!

ট্রাজিডি না, কসাইখানা?

ম্যাকবেথ আরও ঘৃণিত ব্যাপার। ম্যাকবেথের সর্ব্বত্র হত্যা; —তাহার গোড়ায় হত্যা, তাহার মধ্যে হত্যা, তাহার শেষে হত্যা। প্রথমে ডনক্যান, মধ্যে ব্যাঙ্কো, শেষে নিজে ম্যাকবেথের

হত্যা,—নাটকের প্রায় সমুদায়ই কসাইখানা। মধ্যে যখন লেডি ম্যাকবেথ উদয় হইয়া বলিতেছেন, আমার রক্তহস্ত যে কিছুতেই ক্ষালিত হইতেছে না; তখন যেন সেই কসাইখানা আরও দেদীপ্যমান হইতে থাকে। তাহার সামান্য অনুতাপের চিত্র সেই রক্ত-গঙ্গাকে আরও উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া দেয়। প্রকাণ্ড গৃহদাহে দু ফোটা জলের মত সেই অনুতাপ অগ্নিশিখাকে আরও যেন প্রজ্বলিত করিয়া দেয়। সে অনুতাপ বিষকুম্ভে ক্ষীরমাত্র। সেরূপ সামান্য অনুতাপচিত্রে কি ভয়ানক হত্যা ব্যাপার ঢাকে? নাটক মধ্যে কোন্ চিত্রের গৌরব অধিক? সমস্ত হত্যাকাণ্ডের, না, সেই অনুতাপচিত্রের? হত্যা, নাটকের সর্ব্বত্র; অনুতাপ, এক স্থানে মাত্র। সে অনুতাপচিত্র রক্ত-গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ঘোর হত্যাপূর্ণ নাটকের প্রলোভনস্বরূপ।

সেক্সপিয়ারের সমস্ত বড় বড় নাটকে বীভৎস ব্যাপার। হ্যামলেটের শেষ অঙ্কও কসাইখানা। রিচার্ড দি সেকেণ্ড এবং থার্ড, জন, লিয়ার, কোরাওলেনস প্রভৃতি সকল নাটকই হত্যাকাণ্ডে পরিপূর্ণ। জুলিয়স সিজরে কি ভয়ানক রবে এই কথাগুলি প্রতিশব্দিত হয়!—Beware the Ides of march! সিজরের হত্যার পর এই শব্দগুলি মনে হইলেই হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। কোথায় নাটকীয় করুণ রস! আজিও আমরা ম্যাকবেথের নাম করিলে শিহরিয়া উঠি, রিচার্ড দি থার্ডের ঘৃণিত ব্যাপার হইতে শত হস্ত দূরে যাই! নাটক পড়া দূরে থাক, মনে হয়, আর Tragedy পড়িব না।

সাহিত্যে খুন বিলাতী স্থরুচিরও বিরুদ্ধ।

সেক্সপিয়ার কি শুদ্ধ তাঁহার ট্র্যাজিডিতেই ছুরিকা বাহির করিয়াছেন? লিখিতেছেন Comedy, সেখানেও সেই ছুরিকা। Merchant of Venice পাঠ কর, সেখানেও তোমার চক্ষু সমক্ষে ছুরিকা শাণিত হইতেছে! নাটককে কসাইখানায় পরিণত করা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ এবং অতি ঘৃণিত ব্যাপার। এই দেখুন, স্থরুচি-সম্পন্ন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক Addison কি বলিতেছেন:—

But among all our methods of moving pity or terror, there is none so absurd and barbarous, and which more exposes us to the contempt and ridicule of our neighbours, than that dreadful butchering of one another, which is so very frequent upon the English stage. To delight in seeing men stabbed, poisoned, racked, or impaled, is certainly the sign of a cruel temper; and as this is often practised before the British audience, several French critics, who think these are grateful spectacles to us, take occasion from them to represent us as a people that delight in blood. It is indeed very odd to see our stage strewed with carcasses in the last scenes of a tragedy, and to see in the wardrobe of the play-house several daggers, poniards, wheels, bowls for poison and many of the instruments of death."

খুনে রসভঙ্গ ঘটে।

এডিসন রঙ্গভূমিতে রক্তারক্তি করাকে যেরূপ জঘন্য ও বর্ব্বরতার পরিচায়ক বলিয়া ঘৃণা করিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হত্যা ও খুন কখন মানুষের আনন্দজনক হয় না। নাটক নবরসের আশ্রয়ভূমি। Tragedy করুণ ও ভয়ানক রসের আশ্রয়। হত্যা বা খুন কখন ভয়ানকের চরমসীমা নহে। রসের পরিপুষ্টিসাধন করিতে হইলে তাহাকে আনন্দজনক করা চাই। যাহা আনন্দজনক না হয়, তাহা রসের পরিচায়ক নহে। কিন্তু শাণিত ছুরিকা বসাইয়া হত্যা করাতে কি আনন্দানুভব হয়, না ঘৃণার সঞ্চার হয়? হত্যাকাণ্ড দ্বারা আমরা ভয়ানকের নিশ্চয় রসভঙ্গ সাধন করি। নাটককে কসাইখানায় পরিণত করাতে, রসের পরিপাক হয় না; তাহা কবিত্বের হানিজনক এবং রসভঙ্গদোষে দুষ্ট হয়। Butchery is not poetry.

আমরা এ কথা বলাতে, সেক্সপিয়ারের সকল ট্র্যাজিডিতে যে একেবারেই কবিত্ব নাই, এমন কথা বলিতে চাহি না। খুন না করিলে কি করুণ রসের পরিপুষ্টিসাধন করা যায় না? যিনি না করিতে পারেন, তিনি বিভাবাদি দ্বারা রসের পরিপাক-সাধনে নিতান্ত অসমর্থ। তাঁহার সে রসগ্রহণ করাই অন্যায়। খুনের প্রতি মানুষের স্বভাবতঃই ঘৃণা। খুনের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করিবার জন্য নাট্যসাহিত্যের সাহায্য আবশ্যক হয় না। যে কার্য্য হইতে ভদ্র সমাজ স্বতঃই নিবৃত্ত, সাহিত্যে তাহার উজ্জ্বল চিত্র ধরাতে বরং বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। একটা সমগ্র রাজবংশ মধ্যে কয়টা হত্যাকাণ্ড ঘটে? আমি যুদ্ধের কথা বলিতেছি না।

রাজ্যলোভে অরঙ্গজীবের হত্যাকাণ্ডের মত হত্যার কথা বলিতেছি। প্রকৃতপ্রস্তাবে ওথেলোর ন্যায় কয় জন লোক দেখা যায়? বাস্তবিক, সেক্সপিয়ার ওথেলোকে যেরূপ অতিরঞ্জন করিয়াছেন, তাহাতে ওথেলোও যেন কিয়ৎপরিমাণে অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। লোক তত দূর নির্ব্বোধ হয় কি না সন্দেহ,— বিশেষতঃ ওথেলোর মত একজন বীর সেনাপতি। সেক্সপিয়ারের কিংজনে যে স্থলে হিউবার্ট উত্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা আর্থরের চক্ষুঃ উৎপাটন করিতে আসিয়াছে, এবং সেই কার্য্যের উদ্যোগ হইতেছে, সে স্থলের অভিনয় কতই না ঘৃণার উৎপাদন করে! রক্ষা এই, সে কার্য্য ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু দেখা গেল, নৃশংস (John) জনের পীড়নের জ্বালায় সেই রাজপুত্র কারাবাসের উচ্চপ্রাচীর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া মরিল। তাহার আত্মহত্যা কাহার না হৃদয়ে অনর্থক বেদনার উৎপাদন করে? এরূপ বীভৎস চিত্রের ফল কি? রাজ্যলোভের ঘৃণিত পাপচিত্র দেখাইবার জন্য কি এ চিত্রের অবতারণা? কয় জন রাজাই বা সেরূপ ঘৃণিত হইতে পারেন? হইলেই বা কিসে সে লোভ হইতে তাহাকে নিবারণ করিতে পারে? তবে সে চিত্র সাধারণ লোকের সম্মুখে কেন? নাটক কিছু ইতিহাস নহে। ইতিহাসের সম্পত্তি ইতিহাসে রাখিয়া দিলেই ভাল ছিল। সেক্সপিয়ার যেখানে Bnt-chery না করিয়া ট্র্যাজিডি রচনা করিয়াছেন, আমরা সে রচনার যারপরনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। তাঁহার অনেক Tragi-Comedy এই ধাতুতে গঠিত। সেরূপ রচনাকে আমি ট্র্যাজিডি-শ্রেণীভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত নহি। আইমজিন তত কষ্ট সহ্য করেন নাই যে, তিনি চিরদুঃখিনী দময়ন্তী বা সীতার মত জগতের

সন্তাপভাজন হইতে পারেন। সিম্বেলিন বিয়োগান্ত হইলে যদি আইমজনের সহিত লিয়নিটসের মিলন না ঘটিত, তাহা হইলে আইমজিমেতে লোক অধিকতর কাতর হইত। সীতার সহিত শেষে শ্রীরামের মিলন না হওয়াতে তাঁহার বিয়োগ-ব্যাপার এবং বনবাস অধিকতর কাতরতার কারণ হইয়াছে। সীতা জনকালয়ে প্রেরিত হইলে এ কাতরতা ঘটিত না। সীতার বন-বাস কাব্যের করুণরসকে চরমসীমায় লইয়া গিয়াছে। বিয়োগান্ত উত্তরচরিতের স্থায়ী ফল এজন্য এত অধিক। ভবভূতির "ছায়াতে" সে ফল অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া পড়িয়াছে। বিয়োগে কাতরতা উৎপাদন করে, কিন্তু হত্যাকাণ্ডে বীভৎস রসের সঞ্চার হইয়া রসভঙ্গ ঘটে। ডেস্‌ডিমোনাকে মনে হইলেই তাহার খুন হয়, অমনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। সুতরাং রসভঙ্গ ঘটে।

Horace বলেন, রঙ্গভূমে প্রকাশ্যরূপে খুন করাতেই দোষ; খুন যদি প্রকাশ্য রঙ্গভূমে কৃত না হয়, তাহাতে দোষ নাই। এ কথা কোন কাজেরই নহে। খুনের নাম শুনিলেই লোকে শিহ-রিয়া উঠে। কলিকাতায় যে সকল খুন হয়, লোকে তাহা কি প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকে? না দেখিলেও হত্যাকাণ্ড শুনিলেই মনে মনে তাহার চিত্র অঙ্কিত হয়, কল্পনা রক্তারক্তি মনে চিত্রিত করিয়া দেয়। শিশুহত্যা, নারীহত্যা, স্বামিহত্যা, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যার নাম শুনিলেই প্রাণ শিহরিয়া উঠে। লোক স্বচক্ষে যেন সেই হত্যাকাণ্ড জাজ্বল্যমান দেখিতে থাকে। সুতরাং নাট-কের মধ্যে হত্যাকাণ্ড আনিলেই, তাহাতে রসভঙ্গ ঘটে, এবং প্রকাশ্যরূপে সেই খুন দেখান বা না দেখান, উভয়ই সমান কুফল প্রসব করিয়া থাকে। গ্রীক ট্র্যাজিডি এই ঘোর হত্যাকাণ্ডে

কলঙ্কিত ছিল বলিয়াই যে সে দোষ গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। ইউরোপে নাটকারগণ তাহা গ্রহণ করিয়া কুরুচিই পরিচয় দিয়াছেন; তাই বলিয়া আমরাও কি তাহা গ্রহণ করিয়া আমাদের হিন্দু নামে ও আর্য্যগৌরবে জলাঞ্জলি দিব? ইংরাজীর অনুকরণ করিতে গিয়া তাহার দোষগ্রহণে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি চাহিয়া দেখ, সে সাহিত্য সে দোষে কলঙ্কিত নহে। স্বদেশীয় রত্নরাজি উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বর্ব্বরতার একশেষ রক্তারক্তিতে হাত কলুষিত করি কেন?

সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডিপাঠের কুফল।

সেক্সপিয়ার এদেশে সুপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বসাধারণগ্রাহ্য বলিয়া, আমি তাঁহারই দৃষ্টান্ত দিয়া এ প্রস্তাব লিখিয়াছি। সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমস্ত যত লোকে পড়িয়াছে, তত অন্যান্য ইংরাজী নাটক নিশ্চয় পড়ে নাই। এমন কি, সেক্সপিয়ার আমাদের কলেজের ছাত্রগণ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন। অতি তরুণ বয়স হইতেই আমাদের রুচি কলুষিত হইতে থাকে। তাই, পরীক্ষায় নিষ্ফলতা হেতু কখন কখন কোন কোন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রকেও আজিকালি আত্মহত্যা করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। আত্মহত্যা পাপে তাহাদের ঘৃণাবোধ হয় নাই। আত্মহত্যার প্রতি তাহাদের ধর্ম্মভীরুতা জন্মে নাই। কারণ, যে সাহিত্যে তাঁহারা শিক্ষিত, তাহাতে যে আত্মহত্যা করা মহাপাপ, এমন চিত্র অঙ্কিত হয় নাই। সে আদর্শ সংস্কৃত কাব্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির সাহিত্যে

আছে কি না, জানি না। ইংরাজেরা যাহাই বলুন, তাঁহাদের রুচি লইয়া আর্য্য রুচিকে দূষিত করা কখনই বিধেয় নহে।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রতি পক্ষপাত।

এই কুরুচিতে আমরা এত দূর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি যে, এখন আমরা ইংরাজী সাহিত্যের কোনরূপ নিন্দা সহিতে পারি না। যাহা বাস্তবিক নিন্দার্হ, তাহারও নিন্দা করিলে শরীর জ্বলিয়া উঠে। আমরা সেই সাহিত্যের এত দূর পক্ষপাতী হইয়াছি যে, তাহার নিন্দা শুনিলে দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্যের তদ্রূপ দোষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে যাই। কিন্তু একজনের দোষ ও পাপ যে অন্যের দোষ ও পাপ দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে না, তাহা স্মরণ করি না। শ্যাম, রাম ও হলধরের দোষ দেখাইতে পারিলে কি জলধরের দোষ ঢাকে? তথাপি কেমন পক্ষপাত, সংস্কৃত সাহিত্যের দোষ উল্লেখ করিয়া ইংরাজী সাহিত্যের দোষ ঢাকিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমরা বাস্তবিক এ কথার দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। Merchant of Venice নামক নাটকে যেরূপ ছুরিকা শাণিত হইয়াছে, তাহার কথা উল্লেখ করাতে কোন লোক বলিয়া উঠিয়াছিলেন, তোমাদের সীতার অগ্নিপরীক্ষা কি? আমি উত্তর করিয়াছিলাম, তাহা পরীক্ষামাত্র, তাহাতে সীতা পুড়িয়া মরেন নাই; যদি সংস্কৃত কোন নাটকে অগ্নি দ্বারা নায়কনায়িকার হত্যাব্যাপার সাধিত হইত, তাহা হইলে অগ্নিপরীক্ষার আয়োজনে ভয় হইবার সম্ভাবনা ঘটিত, এবং সদৃশ কাণ্ড বলিয়া উল্লেখযোগ্য হইতে পারিত। কিন্তু যখন অগ্নিদাহ

ব্যাপার সংস্কৃত নাটকে দৃষ্ট হয় না, তখন অগ্নিপরীক্ষা ও ছুরিকা শাণিত করা, সমান বা সদৃশ ব্যাপার নহে। জতুগৃহদাহ একটি প্রহসন (Farce) মাত্র; রাজ্যস্থাপন ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য খাণ্ডবদাহ; নাটকে নহে, কাব্যে তাহাদের স্থান। রামায়ণে যেমন অনেক অদ্ভুত কাণ্ড আছে, অগ্নিপরীক্ষা তন্মধ্যে অন্যতম।

নাটকের পর্য্যবসান।

ইংরাজী সাহিত্যের খুন সমর্থনার্থ অনেকে বলেন, তাহা স্বাভাবিক ব্যাপার; কিন্তু সীতার স্বর্গারোহণ অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক। ট্র্যাজিডির ঘোর হত্যাকাণ্ড চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া চুপ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কিরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার বলিতে পারি না। পাপমাত্রই মানুষের স্বাভাবিক ব্যাপার বটে, কিন্তু এ কাণ্ড যে পাপের চূড়ান্ত! হত্যার মত জঘন্য ও সর্ব্বজনঘৃণিত পাপ কি আর আছে? এই স্বাভাবিক ব্যাপার কবি নাটকমধ্যে আনেন কেন? তাহা নাটকীয় কৌশলমাত্র। যখন সীতা স্বর্গারোহণ করিলেন বা পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন, যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিলেন, রাম সরযূতে মিশাইয়া গেলেন, দ্রৌপদী, অর্জ্জুন, ভীম প্রভৃতি হিমালয়ের মহাপ্রস্থানে অদৃশ্য হইলেন, তখন সকলেই জ্ঞান করিলেন, কবি সেই কৌশলে তাহাদিগকে কাব্য হইতে অপসৃত করিয়া লইলেন। খুন করিয়া স্বাভাবিক ভাবে অপসারণ করা অপেক্ষা এরূপ অপসারণ শতগুণে শ্রেষ্ঠ। খুন করিয়া অপসারণ করা নাটকীয় কৌশল ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না! তদ্রূপ পাতালপ্রবেশ ও স্বর্গারোহণাদিও কৌশল-

বিশেষ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সকলেই তাহা সেই অর্থে বুঝিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা গ্রন্থ "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হয়! কিন্তু ট্র্যাজিডির হত্যাকাণ্ড দ্বারা গ্রন্থ সমাপ্ত করিলে, এক বীভৎসকাণ্ডে পর্য্যবসিত হয়। এরূপ পর্য্যবসান নিতান্ত নিন্দনীয়।

কেহ কেহ বলিবেন, হত্যাকাণ্ড যে সকল স্থানেই নাটকীয় কৌশল, এমন নহে; কোন কোন স্থানে তাহা অবশ্যম্ভাবী। ডেস্‌ডিমোনার হত্যা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার, তাহা ওথেলোর আখ্যানবীজমধ্যে নিহিত; নহিলে ওথেলো-চরিত্রের পরিপুষ্টি সাধন হয় না। ওথেলোর পরিণাম, ঘটনার পর্য্যায়ক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা বলি, এরূপ স্থলে বিষয়নির্ব্বাচনের দোষ। যে প্রতিভা ঘটনাচক্রকে অন্য দিকে ফিরাইয়া দিতে না পারে, সে প্রতিভারও ত্রুটি আছে। সেক্সপিয়ারে প্রতিভার দোষ নহে, সেক্সপিয়ারে রুচির দোষ—সে রুচি এরূপ হত্যাব্যাপারে আনন্দ পাইত, সে রুচি একজন কৃষ্ণকায় মুরকে ঐরূপ নির্দ্দয় পামর রূপে চিত্রিত করিতে বড় আমোদ লাভ করিত। সেক্সপিয়ারের শুদ্ধ নিজের সাধারণ রুচি নহে, তখনকার কালের রুচি ঐরূপ ছিল, ইংরাজ জাতির রুচি ও প্রবণতা একজন মুরকে ঐরূপ চিত্রিত দেখিতে বড়ই আনন্দলাভ করে। আজিও এই রুচির পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি। তবে দুই দশ জন যদি এ রুচির বিরোধী থাকেন, তাঁহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে।

আমাদের বেণীসংহারের বিষয়নির্ব্বাচনে এইরূপ দোষ দেখা যায়। যে আখ্যায়িকার পরিণামে দুঃশাসনের রক্তপান করিতে করিতে দ্রৌপদীর বেণীবন্ধন হইবে, সে বিষয় নির্ব্বাচনের দোষ

বা য় না ত কি? ভট্টনারায়ণের অন্যবিধ পর্য্যবসান করিবার সাধ্য ছিল না।

দুষ্ট বঙ্গসাহিত্য ও রঙ্গালয়।

ইংরাজী ট্র্যাজিডির দোষ এক্ষণে বঙ্গসাহিত্যে প্রচুরপরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিষপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভয় আমাদের অনেক স্ত্রীলোকের মন ও কল্পনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা রঙ্গভূমে ম্যাক্‌বেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাক্‌বেথের বিষ ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচি-সম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছেন। পরের পাপ ঘরে আনিয়াছেন।

মহাভারত ও রামায়ণের অধ্যয়নফল।

ইংরাজীওয়ালাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত বলিয়া উঠিবেন, তোমাদের সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে কি খুন নাই? আমরা বলি, যথেষ্ট আছে। মহাভারতে অনেক খুন আছে। পাণ্ডব-শিবিরে পঞ্চশিশু-হত্যা কি? আতিথ্যধর্ম্মরক্ষার্থ শিবির পুত্র-বলি কি?

এ সমস্ত ব্যাপার আমাদের সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে নাই, তাহা

শ্রব্যকাব্যে আছে। শ্রব্যকাব্যের সহিত দৃশ্যকাব্যের যে প্রভেদ, আমরা প্রথমেই তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। তাহার বিচার করিলে শ্রব্যকাব্যের এ দোষ, দোষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য হইবে না।

মহাভারত ও রামায়ণের অধ্যয়নফল বা ইষ্টার্থ অতিশুভ-জনক। বাস্তবিক, সমুদায় রামায়ণ ও মহাভারতের অধ্যয়ন-ফল হেতু আজিও হিন্দুসমাজে ধর্ম্মের বল ও প্রভাব এত প্রবল রহিয়াছে। যে ধর্ম্মতেজ ও ধর্ম্মবল সেই দুই মহাকাব্যের প্রাণ, তাহা সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমরা দান-বীরের পুত্রবলি দেখি, তখন আমাদের ধর্ম্মভাব এত উচ্চে উঠে যে, অন্য সকলই নিম্নতলে যায়। আমরা শিবির ধর্ম্ম ও দান-বীরত্বে মাতিয়া পড়ি। যে দান-ধর্ম্মের জন্য তিনি সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিতেন, তাহার নিকট পুত্রবলি কি? সেই বলিতে ত্যাগের গৌরব এবং দানবীরত্বের ধর্ম্মভাব পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মের উচ্চতায় আমরাও ক্ষণিকের জন্য উত্থিত হইয়া শিবির ধর্ম্মানন্দে মত্ত হই। পুত্রবলি তখন তুচ্ছ বোধ হয়। আর্য্যধর্ম্ম-প্রাণ শুদ্ধ ঋষি-চরিত্রে ছিল না, যথার্থ ক্ষত্রবীরেও তাহা বর্ত্ত-মান ছিল। ব্যাস পুরাণে তাহা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কুরু-কুলের সহিত যখন কর্ণ রণমদে মত্ত হইয়াছিলেন, তখনও তিনি দানবীরের ধর্ম্মপালন করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া অকাতরে ইন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া নিজ অমোঘ কবচ ও কুণ্ডল দান করিয়া-ছিলেন। এই আখ্যানপাঠের ফল ধর্ম্মের উত্তেজনা, ধর্ম্মবলে বলীয়ান হওয়া। তদ্দ্বারা প্রকৃতি দূষিত হয় না, কিন্তু আরও উন্নত হইয়া উঠে। ধর্ম্মের জন্য, দানবীরত্বের জন্য হিন্দু সর্ব্ব-ত্যাগী হইতে শিক্ষা করে।

আর, পঞ্চ-শিশুহত্যা কি? তাহা দুর্য্যোধনের আসুরিক পাপ-পক্ষীয় ব্যাপার। ব্যাস সেই ঘটনার ঘোর তামসিকতা দেখাইয়াছেন। ভক্ত কাশীদাস কিন্তু তত দূর সহ্য করিতে পারেন নাই। এজন্য তিনি সেই ঘটনায় একটু বিচিত্রতা দিয়া তাহার পাপ-মলিনতা কথঞ্চিৎ অপনয়ন করিয়া তাহাকে বরং শিক্ষাপ্রদ করিয়াছেন। কাশীদাসে আমরা দেখিতে পাই, তাহা রণব্যাপারের মধ্যে একটি ভ্রান্তি মাত্র,—যে ভ্রান্তিতে দুর্য্যোধনেরও হরিষে বিষাদ জন্মিয়াছিল। দুর্যোধন এত যে পাণ্ডব-বিদ্বেষী ছিলেন, তিনিও তাহাতে বিষাদিত। রণকাণ্ডের গোলমালে কত ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, এবং সেই যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ভীষণ পরিণাম ও বিষময় ফল প্রদর্শন করিবার জন্য ঐ ঘটনার উল্লেখ। যাঁহারা মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট এ ঘটনায় কোন দোষ নাই। যাঁহারা কাব্যরূপে মহাভারতকে দেখেন, তাঁহারাও দেখিবেন, যুদ্ধকাণ্ড কি ভয়ানক ব্যাপার! জ্ঞাতিবিরোধের বিষম পরিণাম কি ভয়ানক! যে কাব্যে এইরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা পুরাণ। আপামর সামান্য জনগণের ধর্ম্মোন্নতিসাধন এবং হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান করিবার জন্য পুরাণের সৃষ্টি। সুতরাং, পুরাণের মহদুদ্দেশ্যসিদ্ধির অভ্যন্তরে কোথায় এরূপ বধকাণ্ড লুক্কায়িত থাকে, তাহা অনুভূত হয় না। ট্র্যাজিডিতে বধকাণ্ড প্রধান ঘটনা হইয়া পড়ে; পুরাণের প্রকাণ্ড ব্যাপারে তাহা আচ্ছন্ন থাকে। কেবল পুরাণপাঠের ফলমাত্র হৃদয়ে অনুভূত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে, এবং সেই ফল চিরদিনের জন্য জীবনকে নিয়মিত ও শাসিত করে।

সাহিত্যে প্রেম।

দেবত্ব।

সীতার প্রেম।

সাহিত্যে যদি প্রেম দেখিতে চাও, তবে একবার সীতার পানে চাহিয়া দেখ। রাজর্ষির শান্তিময় সংসারে সীতা সুশিক্ষিতা ও প্রতিপালিতা। প্রেমময় রামের সহিত সীতা বিবাহিতা। তাই সীতা প্রেমের মোহিনী প্রতিমা। যে সীতা রামের সহিত রাজরাণী হইবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে পতির বনবাস হওয়াতে তিনি কি পতির সঙ্গে বনবাসে যাইতে কুণ্ঠিতা হইয়াছিলেন? রাম ত তাঁহাকে বনবাসে লইয়া যাইতে চাহেন নাই, তবু সীতা প্রেমাবেগে অধীরা হইয়া তখনই তাঁহার সহিত বনে যাইতে অগ্রসারিণী হইলেন। রাম যে তাঁহাকে এত বনকষ্ট ও ভয় দেখাইয়াছিলেন, সকলই বিফল হইল। সীতা অকুতোভয়ে পতির অনুসারিণী হইলেন। বনভ্রমণকালে কেবল রামের মুখপানে চাহিয়া সীতা কোনও কষ্টকেই কষ্ট জ্ঞান করেন নাই, কোন ভয়ে ভীতা হয়েন নাই। প্রত্যুত, কাননবাসী ঋষিগণের আশ্রম দেখিতে রামের যত সুখবোধ হইত, সীতারও ততই আনন্দ জন্মিত। পতির যাহাতে সুখ, আর্য্যনারীর তাহাতে সুখ— আর্য্যনারী পতির ছায়া। রাম যেমন আশ্রমপীড়ানিবারণ করিয়া কাননে শান্তিবিধান করিতেন, তদাশ্রিতা প্রেমলতা তেমনি সেই দেশে প্রেমপুষ্প বিকীর্ণ করিতেন। প্রেমালাপে ও প্রেমব্যবহারে

সীতা মুনিপত্নী ও বনবালিকাগণকে প্রেমবন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। বনবাসে রামের সম্মুখে শান্তি যাইত, সীতার সম্মুখে প্রেম যাইত। তিনি প্রেমদূতীরূপে সর্ব্বত্র উদিতা হইতেন। তাঁহার প্রেম বিশ্ববিসারী ছিল। তিনি রামের প্রেমরূপ—যেমন কৃষ্ণের প্রেমরূপ রাধা। অশোকবনেও তাঁহার প্রেমরূপে চেড়ীগণ বাধ্য। প্রেমরূপে তিনি শত্রুকেও মিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার জগৎবিসারী প্রেমরূপের যদি সম্যক ছবি দেখিতে চাও, তবে তাঁহার সহিত একবার গোদাবরীতীরে পঞ্চবটীতে চল। সেই নদীতীরে কর্ণিকাবনবেষ্টিত রামের পর্ণকুটীরে সীতা নন্দনকানন বিরচন করিয়াছিলেন। ইতর প্রাণিগণও সীতাকে ভালবাসিত। বনহরিণীগণ সীতার হস্তে কুশাঙ্কুর গ্রহণ করিত। ময়ূর ময়ূরী সীতার সম্মুখে পুচ্ছবিস্তার করিয়া আনন্দে নৃত্য করিত। কপোত-কপোতী বিশ্রব্ধমনে প্রেমালাপ করিত। বনমৃগগণ হিংসাপরিহার করিয়া সীতার কুসুমকাননে সুখস্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। প্রেমের কাননে শান্তিপুষ্প বিকশিত হইত। সীতার প্রেমসুখ বুঝি ধরিত না, তাই অমৃতধারায় গোদাবরী নৃত্য করিতে করিতে সীতার প্রেমের পরিচয় দিতে দিতে, সুমধুরস্বরে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইত। কাননতরুগণ সীতার পূজোপকরণ পুষ্প সকল বর্ষণ করিত। সীতা সুখমনে পতিসেবা ও বনদেবীর পূজা করিতেন। রামের সুখ অযোধ্যার সিংহাসনে, কি এই পঞ্চবটীর কুসুমকাননে, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য। সীতা সেই কুসুমকাননে স্বর্গসুখ আনিয়াছিলেন। সীতার পঞ্চবটী প্রেমময় রাজ্য। কিন্তু সীতা দারুণ কষ্টে পড়িবেন বলিয়াই বুঝি এত সুখভোগ করিয়া লইলেন।

কবিগুরু বাল্মীকি প্রেমের এই অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন। কালিদাসের ঋষিআশ্রমস্থিত শকুন্তলা বুঝি এই সীতার ছায়ায় সৃষ্ট। মিল্টনের প্যারাডাইসের এড্যাম এবং ইভের প্রেমময় চিত্র কি বাল্মীকির প্রেমচিত্রের সমতুল্য হইতে পারে? এড্যাম এবং ইভ সদ্যঃ সৃষ্ট হইয়া শান্তিময় প্যারাডাইসের সুন্দরবনে অবস্থাপিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সংসারের সুখ দুঃখ, প্রেমহিংসা প্রভৃতি কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের প্রেম, প্রেমই নহে; সুখ, সুখই নহে। যাহাদের কিছু জ্ঞান নাই, তাহাদের অজ্ঞানতায় প্রেমরসের সুখবোধ হইত না। তাই তাহাদের প্রেমচিত্র ও রামসীতার প্রেমচিত্রে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। সীতা দুঃখময় কাননকে প্রেমময় সুখধামে পরিণত করিয়াছিলেন; ইভ সুখময় কাননের অযোগ্যা বলিয়া তথা হইতে বহিস্কৃতা হইয়াছিলেন। একজন পাপসংসারকে প্রেমময় পবিত্র করিয়াছিলেন, অন্য জন পুণ্যময় সংসারে পাপকণ্টক আনিয়া তাহা দ্বেষহিংসায় পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

রাধিকার প্রেম।

অন্য এক আদর্শের প্রেম আর্য্য ভক্তিশাস্ত্রে। তথায় সাত্ত্বিক প্রেম স্থূল মানুষচিত্রে প্রদর্শিত। সেই প্রেমময়ী প্রতিমা রাধাসুন্দরী—গোপীগণ যে প্রেমের সহচরী। রাধিকা মধুর গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা। পতিপত্নীর প্রেম যত উচ্চতায় উঠিতে পারে, রাধিকা সেই উচ্চতায় উঠিয়া কৃষ্ণভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন। তাই সেই ভক্তির নাম প্রেমভক্তি—মানুষ দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণতা ভগ-

বানে সমর্পিত—ভগবান প্রাণবল্লভ। রাধিকা ও গোপী ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে নাই, ভগবান আমার প্রাণবল্লভ। আর বলিয়াছিলেন সত্যভামা, কিন্তু যে কৃষ্ণ রাধিকার প্রেম দেখিয়াছেন, তিনি সত্যভামার বাক্যে হাসিতেন—সে দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। সত্যভামার প্রেম দর্পিত ভক্তি—রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত তুলনায় তাহা অতি দীন। রুক্মিণীর আত্মসমর্পিতা ভক্তির সহিত দাম্পত্য প্রেমের মধুরতা মিশিয়া, গোপীপ্রধানার ভক্তি পূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকা সেই প্রেমভক্তিতে উল্লাসিনী, কৃষ্ণলীলাময়ী, কৃষ্ণপ্রেমে সংসারিণী, শ্যামপ্রেমানুরাগে পাগলিনী, শ্যামপ্রেমে অভিসারিণী, অভিমানিনী, বিহারিণী ও বিলাসিনী। কৃষ্ণই রাধার সর্ব্বস্ব ধন, সর্ব্বসুখ ও সর্ব্বচিন্তা। তিনি সেই শ্যামপ্রেমে মোহিতা। নিত্য শ্যামসহবাসসম্ভোগিনী হইবার জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছিলেন। কে বলে রাধিকা কৃষ্ণবিরহিণী ? তিনি শত বৎসর কৃষ্ণধ্যানে ও স্বপ্নে কৃষ্ণকেই দেখিতেছিলেন। যে প্রেম এক পলের নিমিত্তও কৃষ্ণকে হারাইতে পারে না, সেই প্রেমের সাধনাই কৃষ্ণবিরহ—বিরহেই প্রেমের পরিপুষ্টি। বাসন্তী কৃষ্ণরূপময় বৃন্দাবন ধামে, গোপীগণের নিয়ত ব্রজবুলীময় মধুর ভাষে ও কৃষ্ণকথায় রাধিকা কৃষ্ণস্বপ্নে ভোর হইয়াছিলেন। বিরহে তাঁহার তন্ময়তা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। রাধিকা দেখাইয়াছিলেন যে, কৃষ্ণবিরহ অসম্ভব কথা ; রাধাকৃষ্ণ চিরদিন সংসারের কদম্বমূলে বিরাজিত। তাই উন্মত্তা রাধিকা সর্ব্বদাই দেখিতেন,—

"নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে
রাধিকারমণ।"

সীতা-প্রেমের ঐকান্তিকতা।

সীতার বিরহ অন্যরূপ। সীতার বিরহ সুখের বৃন্দাবনধামে নয়; সে বিরহ রাক্ষসপুরীর চেড়ীদলপূর্ণ অশোবনের যন্ত্রণাগারে। কিন্তু সেই যন্ত্রণাগারে সীতা অশোকবনকে রামময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই সেই রামময়-স্মরণে জীবিতা ছিলেন। তিনি রাক্ষসকুলের ভয়ে ভীতা হইয়া আরও একান্ত মনে সেই শ্রীরামকে স্মরণ করিতেন। আতঙ্ক তাঁহার ভক্তি ও পতি-প্রেমকে আরও পরিপুষ্ট করিত। তিনি অহরহঃ ভাবিতেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যাম-কান্তি। তাঁহার পতিধ্যান আরও তীব্রতর হইয়াছিল। বিশ্রব্ধ মনে রামের কথা কহিতেন কেবল সরমার সঙ্গে —ততই মধুর ভাষে, যত মধুর ভাষে লিখিয়া গিয়াছেন শ্রীমধুসূদন। অগ্নিপরীক্ষাকালে এই প্রেমপ্রগাঢ়তার পরীক্ষা হইয়াছিল। রামের প্রেমাঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া অশোকবনে রক্ষিতা হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আশা ছিল, রামের পুনর্লাভে আবার সেই প্রেমাঙ্কে পুনঃস্থাপিতা হইবেন। তিনি সেই প্রেমাশাতেই জীবিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁহাকে যখন বনবাসে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার কোন্ আশা ছিল? তবু সীতা নিজ আর্য্যপুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলেন। ছিন্না লতার ন্যায় তিনি রামাশ্রম হইতে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। তাপসাশ্রম অশোকবন নহে সত্য, কিন্তু এ বন সে অশোকবন হইতেও ভয়ঙ্কর—আশাহীন দেশ! তাপসবনে সীতা নিরাশ প্রেমের চিত্র। রাম নিজে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন; কিন্তু সে বিসর্জ্জন, প্রেমবিসর্জ্জন নহে, তাহা প্রজানুরাগে কর্ত্তব্যের বলি মাত্র।

সেই বিসর্জ্জনে সীতা রামের আরও উদ্দীপ্ত প্রেমভাগিনী হইয়াছিলেন। সেই প্রেমে সীতার আর অভিমানের স্থান নাই—হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তথাপি সীতা কেবল রামপ্রেমে সকলের আদরিণী হইয়াছিলেন। রামপ্রেমে তিনি দিবানিশি বিষণ্নমনে ও অধোবদনে অশ্রুবর্জ্জন করিতেন। এক একবার সন্তানের মুখপানে চাহিয়া রামকে স্মরণ করিয়া সেই রূপের পূজা করিতেন। সন্তানের মুখে রাজীবলোচন রামচন্দ্রকে দেখিতেন, আর দর দর অশ্রুধারায় নির্জ্জনবাস ভাসাইয়া দিতেন। সীতা কেবল রামপ্রেমজীবিতা হইয়া সেই আশ্রমে ছিলেন। এই আশ্রমবাসে তাঁহার প্রেম কত প্রগাঢ় হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পাতালপ্রবেশকালে প্রতীত হইয়াছিল। রামের মুখ হইতে আবার পরীক্ষার কথা শুনিয়া সীতার বুক ফাটিয়া গেল। পিতৃসম বাল্মীকি, অন্যান্য গুরুজন, দেবগণ, পুত্রগণ এবং সভার সর্ব্বজনসমক্ষে তত হতমান হইয়া সাধ্বী আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে মাতৃ-অঙ্কে বসিয়া প্রেমপ্রতিমা সতী কেবল রামের পানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া অদৃশ্যা হইলেন। সতীর প্রেম পবিত্র নিকেতনে বিসর্জ্জিত হইল।

সতীত্ব-গৌরব।

সতীর পতি-অনুরাগ কত অমানুষী সীমায় যাইতে পারে, তাহা এই সীতার দৃষ্টান্তে প্রতীত হয়। প্রেমময়ী সীতা কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সীতা সতীত্বের এবং পতিপরায়ণতার চরম সীমা। আর্য্যসাহিত্য এই সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব শতমুখে কীর্ত্তন করি-

য়াছে। আর্য্যনারীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সেই জন্য এক মহাবল হইয়াছে। সতীর নামমাত্র গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সতী একধ্যানে একমনে কেবল নিজ পতিকেই জানেন। পতিনিন্দায় ভবানী প্রাণত্যাগিনী হইয়াছিলেন। সতী পতির গাত্র স্পর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া যমও অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সতী গলিত-কুষ্ঠ পতিকে তপ্তকাঞ্চনশোভাময় দেহবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। সাবিত্রী যমালয় হইতে পতিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। যত দিন সতীর গৌরব আর্য্যনারীকে পরিপূর্ণ করিবে, তত দিন আর্য্যনারী এক মহাশক্তি। সতীই যথার্থ পতিব্রতা। সতী যেমন আপনি দেবী, তিনি নিজ পতিকেও তেমনি দেবতুল্য ভাবেন। দেবতুল্য ভাবিয়া নিজ পতির দেবসেবা করেন। আর্য্যশাস্ত্র আর্য্যদেশকে সতীত্বগৌরবে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। আর্য্যধাম তাই আজও সতীর অধিষ্ঠানে পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। এই গৌরবে আমাদের শিশু কন্যাগণ বালিকাবস্থা হইতে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। গান্ধারী তাই বিবাহকালেই পতির অন্ধতা শুনিবামাত্র নিজ চক্ষু চিরদিনের নিমিত্ত বসনে ঢাকিয়াছিলেন। সাধ্বী সাবিত্রী বিবাহ হইবার পরই মৃত পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া পরিশেষে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। আর্য্যবালা তরুণবয়সেও পতিহীন হইলে অমনি হাহাকার করিয়া উঠেন। এই গৌরবপূর্ণ ভারতে সীতা সর্ব্বজনপূজনীয়া হইয়া রহিয়াছেন। কেবল সীতা কেন? সকল সতীই এখানে পূজনীয়া—সতী ভবানী, পার্ব্বতী, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, গান্ধারী, দময়ন্তী প্রভৃতি সবাই ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়া আছেন। তাঁহাদের নাম করিবামাত্র মনে পবিত্র ভাব সঞ্চারিত হয়। আমরা তাঁহাদের

মধ্যে কেবল একজনকে দৃষ্টান্তস্বরূপ নির্ব্বাচন করিয়া সীতার কথা উল্লেখ করিয়াছি।

যে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব আমাদের পৌরাণিক কাব্যে, নাটকে এবং উপন্যাসে ঘোষিত হইয়াছে, যে গৌরবে পূর্ণ হইয়া ভারতীয় আর্য্যললনা ধৈর্য্য, তিতিক্ষা, অধ্যবসায়, কার্য্যদক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি নানা গুণে ভূষিতা হইয়া রমণীরত্ন—যদ্দ্বারা তিনি পরিপূতা হইয়া দেবোপমা হইয়াছেন, সেই সতীত্ব ও পতিব্রত্যধর্ম্মের গৌরব ভারতে নানা উপায়ে রক্ষিত হইয়া থাকে।

(১) কথকতা ও গান। আমাদের বাক্‌চতুর ও বুদ্ধিমান কথকগণ স্ত্রীজাতীয় শ্রোতৃবর্গের মনে এই দুই ধর্ম্ম চিরদিন বদ্ধমূল করিয়া দিয়া আসিতেছেন। পৌরাণিক রামায়ণ এবং মহাভারতগানেও সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। আজিও এই দুই উপায় বঙ্গধামে বিদ্যমান আছে। তদ্দ্বারা আমাদের পুরাণোক্ত পতিভক্তি ও পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অতি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত এবং কীর্ত্তিত হইতেছে। গায়ক এবং কথকেরা নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া সেই দুই ধর্ম্মের গৌরব মনোহর গানে এবং সুন্দর বাক্‌কৌশলে বর্দ্ধিত করিয়া দেন।

(২) গল্প কথায় আমাদের বৃদ্ধা ও বৃদ্ধ, কর্ত্তৃপক্ষগণ রামায়ণ মহাভারতের গল্পাদি মুখে মুখে গল্প করিয়া, এবং যাঁহারা পড়িতে জানেন, তাঁহারা গ্রন্থ পাঠ করিয়া, গৃহধামে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব বিলক্ষণ প্রচার করিয়া থাকেন।

(৩) ব্রতানুষ্ঠান। শুধু কাণে শুনিয়া সেই গৌরবে আর্য্যকন্যাগণ পূর্ণ হয়েন, এমন নহে; অনুষ্ঠানেও তাহাতে শিক্ষিতা

হইবেন বলিয়া, আমাদের সমাজে ঋষিগণ রমণীকুলের জন্য নানা ব্রতপদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে সত্যভামা ও সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া স্বামিপূজার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, আমাদিগের বৃদ্ধাগণ আজিও তাহা মুখে গল্প করিয়া বলিয়া থাকেন। শুধু গল্পে নহে, সেই ব্রতাদির নিজে অনুষ্ঠান করেন, এবং বধূ ও কন্যাগণকে তাহাতে প্রবৃত্ত করান। প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠান, ব্রতাদি ও পূজার শেষে যে সকল কথা শ্রবণ করিতে হয়, তাহাতেও সেই দুই ধর্ম্মের গৌরব কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

(৪) দৃষ্টান্ত। আমাদের গৃহধামে বর্ষীয়সী ও গৃহিণীগণ প্রত্যহ নিজ আচরণে ঐ দুই ধর্ম্ম যথাসাধ্য পালন করিয়া, বালিকা ও নববধূগণকে তাহাদের গৌরবে পূর্ণ করেন। আমাদের কন্যা ও বধূগণের সমক্ষে নিত্য যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহা তাহারা দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে থাকে, এবং তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি স্বতঃই ধাবিত হয়। এ শিক্ষা কাহাকেও চেষ্টা করিয়া দিতে হয় না; দৃষ্টান্তই মহাগুরু।

এই সমস্ত উপায় আমাদিগের গৃহধামের নারীশিক্ষা। এইরূপ নারীশিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী। এই শিক্ষাপ্রভাবে আমাদের আর্য্যনারী নানা গুণে ভূষিতা হইতেন, এবং আজিও যেখানে বিলাতী নারীশিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই, সেখানে উক্ত শিক্ষাপ্রণালীর ফল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এ শিক্ষা ভক্তিপূর্ণ পৌরাণিক সাহিত্যপাঠ—যে সাহিত্যে সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব অতি উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সাহিত্যপাঠ। তাহা বিলাতীরুচিসম্পন্ন উপন্যাস-পাঠ নহে। কিন্তু এই শিক্ষা-

প্রণালীতে গ্রন্থপাঠ যত না থাকুক, মৌখিক গল্প কথায়, আচারে, অনুষ্ঠানে ও দৃষ্টান্তে শিক্ষার প্রভাব ততোধিক। তাহাতে সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের সংস্কার দৃঢ়রূপে আমাদের তরুণবয়স্কা তরল-মতি কামিনীকুলের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেয়। তাঁহারা সেই গৌরবে পূর্ণ হইয়া নিজ আচরণ ও দৃষ্টান্তে ঐ দুই ধর্ম্মকে কুলক্রমাগত করিয়া আনিতেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সতী।

কিন্তু এই নারীশিক্ষাপ্রণালীর আজি অনেকাংশে বিপর্য্যয় ঘটি-তেছে। এমন সুন্দর ও পরিপাটী শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তে এখন বিলাতী শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইতেছে। বিলাতী সাহিত্যে আমাদিগের সতীত্ব ও পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব ঘোষিত হওয়া দূরে যাউক, তাহাতে বরং বিপরীত কথাই কীর্ত্তিত হইয়াছে। হইবারই কথা। কারণ, ভারতললনার সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন আদর্শের। একমাত্র পতি-অনুরাগে পূর্ণ হইয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ থাকা ভারতললনার সতীত্ব। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সতীত্ব তাহা নহে। সে সমাজের সতীত্ব এইরূপ ঃ—

প্রথমতঃ, সেই সমাজে রমণীকুল অনেকবার পতি গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং পত্যন্তর-গ্রহণরীতি প্রচলিত থাকাতে, আর্য্যসমাজে যেরূপ একনিষ্ঠতার গৌরব, পাশ্চাত্য সতীত্বে সেরূপ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপীয় সমাজে রমণীরা ইচ্ছাবরা ; তাঁহারা নিজ ইচ্ছায় পতি গ্রহণ করিতেছেন, এবং এক পতি ত্যাগ

করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং সেখানে রমণীকুলের ইচ্ছাই প্রবল। তাঁহারা আপনার মনোমত কার্য্য করিয়া থাকেন; তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত অধিক। এই স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বাতন্ত্র্যের সহিত হিন্দু রমণীর সতীত্ব ও পাতিব্রত্য সমঞ্জসীভূত নহে। কাজে কাজেই এই দুই আদর্শে বিরোধ উপস্থিত হয়।

সাহিত্যে পাতিব্রত্য।

ভারতীয় সমাজ স্বেচ্ছাচার হইতে উন্নীত * হইয়া, মনুষ্যোচিত ব্যবহার সংস্থাপন পূর্ব্বক বিভিন্ন প্রকার সতীত্বের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সেই আদর্শস্থানীয় সতীত্বগৌরব তাঁহাদের সাহিত্যে ঘোষিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমাজের সতীত্বে আর্য্যসতীত্বের বিশেষ প্রকার এবং অসামান্য গৌরব না থাকাতে, সে সতীত্ব ইউরোপীয় সাহিত্যে কীর্ত্তিত হয় নাই। সামাজিক আচার ব্যবহারেই তাহার পরিচয় ও কীর্ত্তন। এই আচার ব্যবহারের দৃষ্টান্তে ইউরোপীয় সাহিত্য পরিপূর্ণ হওয়াতে, তৎপাঠে যে ফলোদয় হয়, সেই ফল আমাদের সতীত্বের গৌরব ক্রমশঃ ধ্বংস করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, আমাদের নারীশিক্ষাপ্রণালী একপ্রকার তরিবদ মাত্র। লেখাপড়া জানিলে, পুরাণাদি পাঠে নিজে সমর্থা হইয়া, আর্য্যনারী সেই শিক্ষাপ্রণালীর কেমন অধিকতর গৌরব বাড়াইতে পারেন, তাহা অনায়াসে

* মহাভারতীয় আদিপর্ব্বান্তর্গত শ্বেতকেতুর বিবরণ কে না জানে?

প্রতীত হইতেছে। কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলেও অধিক ক্ষতি নাই। কারণ, প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আচরণে ও ব্যবহারে, শ্রবণে ও দৃষ্টান্তে। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম বিশেষতঃ সমস্তই সতীর আচরণে নির্ভর করে। যে ইউরোপীয় সমাজে ভারতীয় সতীত্বের অভাব, সেখানে সুতরাং ভারতীয় পাতিব্রত্য ধর্ম্মের সমধিক অভাব হইবে। কারণ, পাতিব্রত্য ধর্ম্ম আর্য্যসতীত্ব হইতেই সমুদ্ভূত। এই পাতিব্রত্য ধর্ম্ম হেতু ভারতীয় ললনা যে সমস্ত অসামান্য গুণের আধার হইয়াছেন, সেই সমস্ত গুণ ইউরোপীয় ললনায় অল্পপরিমাণেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য ইউরোপীয় সাহিত্যে যে ললনার ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, সে ললনাচরিত্রে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের তেমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নাই। ফল এই, সে সাহিত্যপাঠে আমাদের পাতিব্রত্য ধর্ম্মের গৌরব কমিয়া যায়। সেই সাহিত্যের যতই অনুশীলন হইবে, ততই হিন্দুললনার গুণাংশও ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে। বাস্তবিকই এক্ষণে আমরা এই কুফল প্রত্যক্ষ করিতেছি।

প্রাচীন ভারতে স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন।

ইউরোপীয় সমাজে যে সতীত্ব প্রচলিত আছে, সভ্যতার আদিম অবস্থায় সেইরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকা সম্ভব, এবং প্রাচীন ভারতের স্থানে স্থানে তাহা যে বিদ্যমান ছিল, এমত প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিগ্বিজয়কালে সহদেব যে প্রাচীন মাহিষ্মতী পুরীতে গিয়াছিলেন, তথায় স্ত্রীলোকেরা স্বৈরিণী হইয়া ইচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিত। পাণ্ডুরাজ কুন্তীকে বলিতেছেন ঃ—

"পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। তির্য্যগ্‌যোনিগত কামদ্বেষবিবর্জ্জিত প্রজাগণ অদ্যাপি যে ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুসারে চলিত। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে।"

তৎপরে শ্বেতকেতুর বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পাণ্ডুও বলিয়াছিলেন, মহিলাগণের স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহার। সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ ভারতে এ ব্যবহার পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। এই ব্যবহার পরিবর্জ্জন করিয়া ভারত একদা দেবত্বে উঠিয়াছিল। সেই দেবত্ব ছাড়িয়া আবার কি আমরা তির্য্যগ্‌যোনিগত ব্যবহারে ফিরিয়া যাইব?

আর্য্যসতীর পবিত্রতা।

ইউরোপীয় সাহিত্যে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক স্বেচ্ছাচারিতার প্রাবল্য; আর্য্যসাহিত্যে প্রেম, মানবপ্রকৃতিকে উচ্চে তুলিয়া পবিত্র করিয়াছে। মহাশ্বেতার প্রেম পবিত্র হইয়া দেবারাধনায় পরিণত হইয়াছিল। মহাশ্বেতা কি দেবারাধনার মূর্ত্তি, না প্রেমের পবিত্র ছবি! অচ্ছোদসরোবরতীরে কাননাভ্যন্তরস্থ দেবমন্দিরে মহাশ্বেতা দেবী না মানবী! দেবপূজাচ্ছলে তিনি একচিত্তে সেই নির্জ্জন গহনে কাহার পূজায় নিরতা আছেন? পতিপ্রেমে ও পতির আরাধনায় বাণভট্টের মহাশ্বেতায় যেরূপ পবিত্রতা, তদ্রূপ কালিদাসের উমাচরিত্রে। অপ্সরোধামে শকুন্তলা ততই পবিত্রতায়

উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের পবিত্র প্রেমস্পর্শে মানবপ্রকৃতি পবিত্র হইয়া গিয়াছে!

আর্য্যসতীর আত্মোৎসর্গ।

সতীতে পতি-অনুরাগ এত প্রগাঢ় যে, সেই অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়া সতী আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেন। প্রেমে আত্ম-হারা হইয়া সতী পতির সঙ্গে সর্ব্ব বিষয়ে মিশিয়া যান। পতির ইচ্ছায় নিজ ইচ্ছা এবং পতির সুখে নিজ সুখ মিশাইয়া দিয়া, সতী দাম্পত্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান। আর্য্যধামে পতির সহিত পত্নীর স্বার্থ এক, সুখ এক, স্বর্গ এক। এরূপ একতা না থাকিলে দম্পতী একেবারে মিলিয়া মিশিয়া যাইবে কি প্রকারে? ইউ-রোপে স্বার্থের বিভিন্নতা ও রুচির বিভিন্নতা এবং পারলৌকিক ইষ্টের বিভিন্নতা থাকাতে, ভারতীয় দাম্পত্য প্রেমে যেরূপ আত্মোৎসর্গ, একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা দেখা যায়, পাশ্চাত্য সমা-জের দাম্পত্য প্রেমে সেরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সেখানে দম্পতীমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় ললনা একাগ্রচিত্তে সর্ব্ববিধায়ে পতির অনুগামিনী হইয়া পতির সহধর্ম্মিণী হন। সর্ব্বপ্রকারে পতির এইরূপ সহধর্ম্মিণীর পদে ইউ-রোপীয় ললনার উঠিবার যো নাই। ইষ্টের বিভিন্নতা, তাঁহাকে পৃথক করিয়া দেয়। সেই জন্য আমরা আর্য্যসতীর প্রেমপ্রগাঢ়-তার ছবি ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখিতে পাই না। সহধর্ম্মিণীর দেবতুল্য সতীর চিত্র কেবল আর্য্য সাহিত্যে লক্ষিত হয়। সেই প্রেমচিত্রে দেখা যায়, সতী সুধু ইহজীবনে পতির সহিত মিলিয়া

এক হয়েন নাই, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা, পরলোকেও এক হইয়া দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করেন।

পতিপ্রেম হইতে জগৎপতিপ্রেম।

সতী পতিভক্তিতে যে আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করেন, তাহাই ভগবদ্ভক্তির নিদান। ভগবানে ততই আত্মোৎসর্গ না করিলে ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায় না। যে ভগবৎপ্রেমে ভক্ত আপনাকে ভগবানের পদে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার ইচ্ছায় আপনার ইচ্ছা মিশাইয়াছেন, তাঁহার আনন্দে আপনার সুখ মিশাইয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে আপনার জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ভগবৎ-প্রেমের ছায়া সতীর পতিভক্তিতে লক্ষিত হয়। তাই সতী দেবীরূপে প্রতীয়মানা। সীতা ও রাধিকা এই দ্বিবিধ প্রেমের আদর্শ, অথচ দুই জনেই পরস্পরের প্রতিবিম্ব। প্রভেদ এই, সীতায় পতিপ্রেম অতি উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত—এত উজ্জ্বল বর্ণে যে, তাহাতে দেবভক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; রাধিকায় ভগবৎপ্রেম এত উজ্জ্বল যে, তাহাতে পার্থিব পতিপ্রেম প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। পতিপ্রেম ভগবৎপ্রেমে আরোহণ করিয়া রাধিকাসুন্দরীর প্রেম-ভক্তি। প্রেমের এই ক্রম আর্য্য সাহিত্যে। আর্য্য সমাজেও এই ক্রম। আর্য্য সমাজে যে নারী বিধবা, জগৎপতিই তাঁহার স্বামী। তাঁহার দাম্পত্যপ্রেম ও পতিভক্তি সহজে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়। যেরূপে সহজে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপে সমাজগঠন, সমাজের রীতিনীতিতে আবদ্ধা হইয়া আর্য্যনারী পতিভক্তিতে দেবভক্তি অভ্যাস করেন। স্বামীকে একদা প্রণয়ের পরমবস্তুরূপে

যত্ন, আদর, সেবা ও পূজা করেন। স্বামীর প্রতিমাপূজা হইতে তাঁহার পক্ষে দেবপ্রতিমাপূজায় সমুত্থিত হওয়া সহজ হইয়া আইসে। আবার যে আর্য্যনারী দেবপ্রতিমাপূজায় মহা অনুরক্ত, সেই দেবভক্তিপূর্ণা সতীর স্বামিপূজা সহজ কথা। তাই, সেই স্বামীকে পূজা করিয়া সতী দেবতার পূজা করেন। এই পতিব্রতা সতীর প্রেমে আর্য্য সাহিত্যে দেবত্বের সৌন্দর্য্য।

সাহিত্যে প্রেম।

পশুত্ব।

সতীপ্রেমের লক্ষণ।

আর্য্যকবিগণ অনেক আদর্শের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে আর্য্যসতী-চরিত্রে যে প্রেমাদর্শের সৃষ্টি, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছি। তাহাতে উক্ত হইয়াছে, সতীর প্রেম গোপীপ্রেমের অনুরূপ—ততই নিঃস্বার্থ, ততই এক-নিষ্ঠ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও স্বামিগৌরবে পরিপূর্ণ। এই ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া তাহা দেবভক্তিতে পরিণত হয়। তখন সেই প্রেম দেবতায় উৎসর্গীকৃত হইয়া মানবকে দেবত্বে লইয়া যায়। আমরা এই সতী-প্রেমের ধর্ম্মালোচনা করিলে প্রেমতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি,—

(১) প্রেম, কামানুরাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। পতিকে সুখী করিয়া পতিব্রতা সতী আপনি সুখিনী হইতে চান। বাৎসল্য প্রেমের যে উচ্চ ধর্ম্ম, সতীপ্রেমেরও সেই লক্ষণ। সন্তান-সন্ততিকে সুখে রাখিতে পারিলে যেমন জনকজননীর সন্তোষ, পতি সম্বন্ধে সতীরও অনুরাগ তদ্রূপ। সুতরাং প্রকৃত প্রেম চাহে না, আপনি সুখী হই; প্রেম প্রণয়ভাজনকে সুখী করিতে চায়। সেই সুখে প্রেমের পরিতৃপ্তি। কিন্তু কাম এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত নহে। অন্য দ্বারা কামানুরাগ সুখসম্ভোগ করিতে চায়। ইন্দ্রিয়লালসার পরিতৃপ্তি-

সাধন করিয়া কামরিপু চরিতার্থ হইতে চাহে। প্রেম পরার্থপর, কামানুরাগ স্বার্থপর।

(২) প্রেম পরার্থপর বলিয়া সতী পতির দোষগুণে নিরপেক্ষ। গুণে যাহার অনুরাগ, দোষে তাহার বীতরাগ। গুণ দেখিলে যে ভালবাসিবে, দোষ দেখিলে সে ঘৃণা করিবে। দোষ সকল পুরুষেরই আছে, সুতরাং রূপজ কি গুণজ অনুরাগ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু প্রকৃত প্রেম দোষগুণের পক্ষপাতী নহে। জনকজননী যেমন সন্তান সন্ততির দোষ গুণের নিরপেক্ষ হইয়া তাহাদিগকে অতি যত্নে ও আদরে স্নেহমমতা করেন, তাঁহাদের প্রেম যেমন সন্তানের দোষগুণনিরপেক্ষ, প্রকৃত সতীর প্রেম তেমনি পতির দোষগুণনিরপেক্ষ। জনকজননীর স্বাভাবিক প্রেমের এই অপক্ষপাতিতা, সতীপ্রেমের আদর্শস্থানীয়। তাই মনু বলিয়া গিয়াছেন, পতি হাজার দোষী হইলেও সতীর পরম পূজনীয়। সুধু মনু কেন ? মহাভারত প্রভৃতি আর্য্যশাস্ত্রের সর্ব্বত্র এই উপদেশ। কামানুরাগ, প্রেমের এই উচ্চতায় উঠিতে পারে না। কামানুরাগ রূপ ও গুণের বশীভূত। রূপ চিরস্থায়ী নহে, এবং গুণ কখন একাধারে দোষবিহীন হইতে পারে না ; এজন্য, তাহার পাত্রাপাত্র সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আজি যাহাকে রূপে বা গুণে ভাল বোধ হইল, কামনা তাহাকে বরণ করিল। কালি, অন্য এক জন তদপেক্ষা অধিকতর রূপবান্ বা গুণবান দেখা গেল, কামনা অমনি সেই দিকে নিজ প্রবৃত্তি পরিচালিত করিল। সুতরাং কামনা কখন স্থির নহে, তাহা অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু প্রেমের ধর্ম্ম স্থিরতা। প্রেম নিশ্চল ও একনিষ্ঠ হইয়া থাকে ; কারণ, তাহা দোষে বিচলিত হয় না, এবং গুণের পক্ষপাতী নহে।

আর্য্যসতীর প্রেম তাই একান্ত অনুরাগপূর্ণ, স্থির, অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ। কিন্তু কামান্ধ জনগণের অনুরাগ সর্ব্বদাই অস্থির এবং বিচলিত হইয়া থাকে।

(৩) প্রকৃত প্রেম নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ বলিয়া তাহা নিরাকাঙ্ক্ষ। যাহা দোষগুণের নিরপেক্ষ, অন্য দ্বারা যাহা সুখী হইতে চাহে না, তাহার আকাঙ্ক্ষা কি? সতীর প্রেম বিনিময় ও ব্যবসা নহে। সতী বলিবে না, আগে তুমি ভালবাস, তবে আমি ভালবাসিব,—আগে দাও, তবে গ্রহণ কর। প্রকৃত প্রেম এরূপ বিনিময়ব্যাপার নহে। শকুন্তলা তরুলতা ও মৃগকে ভালবাসিয়া কি সে ভালবাসার বিনিময় চাহিতেন? পতিপ্রেম স্পৃহনীয় বটে, কিন্তু তাহা না হইলে যে সতী পতিকে ভালবাসিবেন না, এমন কিছু কথা নাই। তবে সতীপ্রেমের সহিত পতিপ্রেম সংযুক্ত থাকিলে সে মিলন 'সোণায় সোহাগা হয়'; তাহাতে যেরূপ সুখোদয় হয়, গানে তাহা বলিতেছে,—

"কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।"

তথাপি সতী পতিপ্রেমের নিরাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পতিকে ভালবাসেন। সেই দৃষ্টান্তে নিধু গাইয়া গিয়াছেন,—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

বাৎসল্য প্রেম যেমন নিরাকাঙ্ক্ষ, দাম্পত্যপ্রেম তেমনি হওয়া চাই। সন্তান সন্ততি ভালবাসিবে বলিয়া কি জনক জননী অপত্যস্নেহের বশীভূত হন? কই, তাঁহারা ত অপত্যের প্রেমাভিলাষী হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকেন না,—কবে আমাদের সন্তানেরা

ভালবাসিতে শিখিবে, তবে আমরা তাহাদিগকে ভালবাসিব ও যত্ন করিব? তাঁহারা সে ভালবাসার নিরপেক্ষ হইয়া নিজ নিজ অপত্যকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসেন। আর্য্যসতীও তদ্রূপ পিতা কর্ত্তৃক উপযুক্ত বরে প্রদত্তা হইয়া পতিগৃহে আসিয়া পতিপ্রেম-লাভের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না—কবে পতি ভালবাসিবেন, তবে তাঁহাকে ভালবাসিব। তিনি বিবাহের পর হইতেই পতিসেবায় নিযুক্ত হয়েন, এবং তাঁহাকে জীবনসর্ব্বস্ব-ধনজ্ঞানে যত্ন ও আদর করিতে থাকেন। পতিরও অনুরাগ তাঁহাতে ক্রমশঃই আকৃষ্ট হইতে থাকে। পতিও পত্নীর ভালবাসা অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকেন না। বৈবাহিক যজ্ঞসূত্র-ধারণা-বধি পতি, পত্নীর প্রতি সস্নেহনয়নে দেখিতে থাকেন। কারণ, তিনি যেমন নিজ পত্নীকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিতে পারেন, এক জন ইংরাজ পতি নিজ পত্নীকে সেরূপ আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন না। যে হেতু, ইংরাজ পতিপত্নীর সম্বন্ধ চির-কালের জন্য না হইতে পারে, এবং এ দেশে স্ত্রীজাতির বহুবার বিবাহ প্রচলিত থাকিলে সেইরূপই ঘটিত। আর্য্য দাম্পত্যপ্রেম সুতরাং বিনিময়নিরপেক্ষ এবং প্রেমাকাঙ্ক্ষাহীন। কিন্তু কামা-নুরাগ ঠিক বিপরীত। সে অনুরাগ পরমুখাপেক্ষী। অপরের অনুরাগ না পাইলে কামানুরাগ উদ্দীপিত হয় না; তাহা পর-স্পরবিনিময়ব্যাপার। এই বিনিময়ব্যাপার সম্পন্ন না হইলে, পশুপক্ষীর দাম্পত্যপ্রেম সংঘটিত হয় না বলিয়া, এই অনুরাগ মনুষ্যলোকে পশুত্ব নামে কলঙ্কিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের ন্যায় কামানুরাগ নিরাকাঙ্ক্ষ নহে।

(৪) প্রেম আর এক কারণেও কামানুরাগ হইতে বিভিন্ন হই-

য়াছে। সতী পতিগৌরবে পরিপূর্ণা। ব্রজগোপীগণ যেমন জানিতেন, শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা মহান্ আর কিছুই নাই, পতির গৌরব সতীর নিকট ততোধিক। সন্তান জননীর নিকট প্রিয়তম পদার্থ, এবং জননী সন্তানের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। সুতরাং প্রকৃত প্রেম "মাহাত্ম্যজ্ঞানে" পরিপূর্ণ। কে বলে, সমানে সমানে নহিলে প্রেম হয় না? প্রভু দাসকে ভালবাসেন, দাসও প্রভুকে ভালবাসেন; তদ্রূপ গুরু শিষ্যকে এবং শিষ্য গুরুকে। সম্পর্কের উচ্চনীচতা থাকিলেও প্রেমের বাধা নাই। প্রেমভাজন প্রেমিকের নিকট অতি ব্যথার সামগ্রী। তাহাকে ছোট করিতে গেলে প্রেমিক অমনি বেদনা পাইয়া ক্ষেপিয়া উঠেন। অমনি তিনি বলিয়া উঠেন, কি আমার অমুক কেহ নয়? অমুকের চেয়ে বড় কে? তিনি সেই প্রেমভাজনকে সোণার চক্ষে দেখেন। তাঁহার প্রেমভাজন তাঁহার চক্ষে স্বর্ণময়। স্পর্শমণির ন্যায় প্রেমনিধি যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে স্বর্ণময় করিয়া তোলে, কিন্তু কামানুরাগের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র। যেথানে বাস্তবিক উচ্চনীচতা আছে, কামানুরাগ সেথানে নিজ বিষয়কে সমান করিয়া তুলে; সাম্যভাবে আনিয়া অনুরাগের বিনিময় চাহে। কাম, নীচকে উচ্চে তুলে, এবং উচ্চকে নীচ করে; ছোট লোক বড় হইয়া এবং বড় লোক ছোট হইয়া যথন সমান হয়, তথন কামানুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

প্রকৃত প্রেমের সহিত কামানুরাগের এইরূপ বিভিন্নতা। প্রেম মানবকে দেবত্বে উন্নীত করে, কিন্তু কামানুরাগ তাহাকে পশুর সহিত সমতুল্য করে। নিজে প্রেমময় হরি মানবে প্রেম রূপে দেখা দেন। মানব এই দেবাংশকে যত বিস্তৃত করেন-

ততই তিনি প্রেমময়ের নিকটবর্ত্তী হয়েন, এবং ততই তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইতে যান। কিন্তু যত কামরিপুপরতন্ত্র হয়েন, ততই তিনি নিজ প্রকৃতিকে পশুভাবে পরিণত করিতে যান।

আর্য্যসাহিত্যে কাম।

আর্য্যসাহিত্যে সতীপ্রেমের ধর্ম্ম কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়াছি। সেই প্রেমের সহিত কামানুরাগের বিভিন্নতা দেখাইবার কারণ এই যে, সেই সাহিত্যেই উক্ত দ্বিবিধ অনুরাগেরই চিত্র আছে। আমরা এমন কথা বলিতে চাহি না যে, আর্য্যসাহিত্যে মূলেই ইন্দ্রিয়লালসার ছবি নাই। আমরা বলি, সে ছবির যে কলঙ্ক এবং প্রেমের যে উচ্চ গৌরব, তাহা সেই সাহিত্যে তদ্রূপেই দেখান হইয়াছে। যাহা নিশ্চয় পাপচিত্র এবং পশুত্ব, তাহা সেই কলঙ্করেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। ইন্দ্র দেবতা হইয়াও শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এবং অহল্যার পাপস্পর্শও শাপে বিশোধিত হইয়াছিল। চন্দ্র ও তারার প্রণয় তদ্রূপ ঘৃণার্হ, এবং পাপরূপেই কলঙ্কিত। দেবতাতেও বিভিন্নতা নাই। দেবতারাও কখন কখন পাপকলঙ্কিত হন। যেখানে কোন মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, সেইখানেই কেবল আর্য্য-সাহিত্যে কামানুরাগের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু এই কাম, রিপুরূপে কোনখানে দেখা দেয় নাই। তাহা অপত্যোৎপাদনের উপায়স্বরূপ দেখা দিয়াছে। কোনও মহাজনের জন্মদান আবশ্যক হওয়াতে কামের উদ্ভব হইয়াছে। উদ্দেশ্যসিদ্ধি পর্য্যন্তই তাহার স্থিতি, এবং তৎপরেই তাহার তিরোভাব। যেখানে

আসক্তি ও লালসা, সেইখানেই পাপ। আসক্তিবিরহিত কাম পাপস্পৃষ্ট নহে।

গীতা শিক্ষা দিয়াছেন, আসক্তিবিরহিত কার্য্যের কোন কর্ম্মফল নাই—পাপ নাই, পুণ্যও নাই। কারণ, কোন স্বাভাবিক কার্য্য স্বতঃ দৈহিক কার্য্যমাত্র; মনুষ্যের আসক্তি এবং অনুরাগ-স্পৃষ্ট হইয়া তাহা পাপপুণ্যের ফলপ্রসূ হয়। পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্মতা আমাদের শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার জন্য দেবতা ও মানুষের দৃষ্টান্তে আমাদের আর্য্য কবিগণ কামের অবতারণা করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত গীতার সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকলের স্থূল অবয়বী দৃষ্টান্ত। স্বভাবজাত, আসক্তিরহিত এবং পাপপুণ্যহীন দৈহিক কার্য্য হেতু ব্যাসের জন্ম। ব্যাসের মত এক জন মহাজনের সমুদ্ভব জন্য মৎস্যগন্ধার সহিত পরাশরের ক্ষণেকের নিমিত্ত মিলন। তদ্রূপ ভরতের জন্ম জন্য শকুন্তলার জন্ম, এবং কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব হেতু মহেশের শরীরে ক্ষণেকের নিমিত্ত মদনাবির্ভাব। পাণ্ডুরাজ পাপপুণ্যের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব কুন্তীকে উপদেশ দিয়া দেবতার সত্তায় পঞ্চ পাণ্ডবের উদ্ভব করাইয়া লইয়াছিলেন। বলিরাজ অন্ধ মুনির ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চ পুত্রোৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন। যে অন্ধ মুনি কিছুই দেখিতে পান না, রূপের প্রতি আসক্তি তাঁহার সম্ভব নহে। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত পাপস্পৃষ্ট কামের দৃষ্টান্ত নহে।

যদি বল, আমাদের সাহিত্যে গান্ধর্ব্ববিবাহের চিত্র কি? পূর্ব্বকালে আর্য্যনারী কি স্বয়ম্বরা হইয়া নিজ মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন না? এই স্বয়ম্বরচিত্র কি আর্য্য সাহিত্যে নাই? আছে, অনেক স্থলে আছে। কিন্তু স্বয়ম্বরপ্রথা কেবল

রাজকুলেই ছিল। সাধারণ জনসমাজে ছিল কি না, জানি না; কিন্তু যে চিত্র আমাদের সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে, তাহারই কথা ধর্ত্তব্য। সে চিত্রে দেখা যায় যে, রাজকন্যারাই ইচ্ছাঁবরা হই-তেন। তাও সকলে নহে। রাজকুলে এরূপ প্রথা প্রচলিত করাতে প্রাচীন বীরসমাজে এক মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত। তাহা এক প্রকার রাজনীতি ছিল—যে নীতিপ্রভাবে রাজগণের মধ্যে যেন ড্রাইডেনের (Dryden) এই গীত সর্ব্বদা উদাত্ত স্বরে সঙ্গীত হইত,—

"None but the brave deserve the fair."

"বীরেরি কেবল সুন্দরী রতন।"

স্বয়ম্বরসভায় যখন নৃপতিগণ কোন সুন্দরীরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত একত্রিত হইতেন, তখন তাঁহাদের কেবল গুণেরই পরি-চয় হইত। সুনন্দা ইন্দুমতীকে সমাগত ভূপতিবর্গের সেইরূপ গুণের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে অজরাজগ্রহণে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। হরধনুর্ভঙ্গ ও লক্ষ্যভেদ না করিয়া—তদ্রূপ মহাবীরত্বের পরিচয় না দিয়া—কেহ সীতা ও দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন নাই। কেবল স্বয়ম্বরসভায় এই রূপগুণ ও বীরত্বের পরিচয় হইয়াই পরিশেষ হইত না। যিনি সুন্দরীরত্ন লাভ করিতেন, তাঁহার সেই সুন্দরীকে লইয়া গৃহে যাওয়া দুঃসাধ্য হইত। সুন্দরী যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেন, সেই সমস্ত ভূপতি, ভাগ্যবান বরমাল্য-ধারীকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিতেন। তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তবে সেই সুন্দরীকে গৃহে লইয়া যাওয়া যাইত। এ বড় কম কথা নহে। বিবাহের এইরূপ মহা ব্যাপারের ঘোর গৌরবে সেই সুন্দরী ললনার পাত্রনির্ব্বাচন। স্বয়ম্বরসভায় যে সমস্ত ভূপতি

একত্রিত হইতেন, তাঁহাদের গুণাগুণের পরিচয় হওয়াতে কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণধর, কেবল যে তাহাই প্রতীত হইত, এমত নহে; যাঁহারা গুণাধিক্যে হীনগৌরব হইতেন, তাঁহাদের মুখ কেমন সভামধ্যে ম্লান হইয়া যাইত, এবং সুন্দরীলাভে নিষ্ফল হইয়া তাঁহারা কেমন লজ্জিত হইতেন, তাহারও চিত্র আর্য্য সাহিত্যে প্রদত্ত হইয়াছে। সে ত বিবাহ নহে, তাহা নৃপতিগণের এক প্রকার পরীক্ষারীতি। বীরসমাজে এই বীরজনোচিত রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্য্য সাহিত্যে যে যে স্থানে এই প্রকার বিবাহের বিরাট বর্ণনা আছে, তথায় বীর প্রভৃতি উচ্চ রসের এত সঞ্চার হয় যে, তাহাতেই মন প্রধানতঃ আকৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়লালসা বা কামানুরাগ তথায় কুত্রাপি অনুভূত হয় না।

আর্য্যেরা কামকে প্রকৃত প্রেম হইতে বিভিন্ন বলিয়া বিলক্ষণ জানিতেন, এবং জানিয়া তাই প্রেম ও কামের যেরূপ ধর্ম্মনৈতিক কলঙ্ক ও গৌরব, তাহা সাহিত্য মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কাম কিরূপে পাপস্পৃষ্ট হয়, কিরূপে না হয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; বুঝিয়া সেই অনুরাগের সেই সেই মূর্ত্তি পরিস্ফুটরূপে দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সূক্ষ্মদর্শী আর্য্যকবিগণ ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত ছিলেন বলিয়া এত দূর সূক্ষ্মতা দেখাইতে পারিয়াছেন এবং সেই সূক্ষ্মতা দেখাইবার নিমিত্তই কামের বিভিন্ন মূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে সেরূপ অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে যে কাম বাস্তবিক পাপস্পৃষ্ট, তাহাকে সেইরূপেই কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। যেখানে পাপছবির ঈষৎ স্পর্শে সাহিত্যের গৌরব হানি হইয়াছে, সেখানে আবার উচ্চরসের সঞ্চার করিয়া দিয়া সেই গৌরব দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

সতীর সখ্যপ্রেম।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন চিত্র। সে সাহিত্যে যে প্রেমের চিত্র নাই, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু সে প্রেমের বিভিন্ন মূর্ত্তি। আমরা আর্য্য সাহিত্যের সতীপ্রেমের যে সকল ধর্ম্ম বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, সে ধর্ম্মাক্রান্ত দাম্পত্য প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে অতি দুর্ল্লভ। এ সাহিত্যে যে প্রেমচিত্র, তাহা সখ্য-প্রেম—সখার সহিত সখার যে প্রেম, সমানের সহিত সমানের যে প্রেম, সেই প্রেমচিত্র। এই সখ্যপ্রেম অতি মধুর বটে। এই মধুর সখ্যভাব আর্য্যসতীতেও আছে, কিন্তু তাহা কান্তাভাবের অধীন। স্বামী সতীর পরম সখা, সতীও স্বামীর পরম সখী; সেই সখ্যপ্রেমে তাঁহারা সর্ব্বদাই ভাসিতেছেন। সতী স্বামীর আদরের আদরিণী; স্বামীও সতীর শত আদরের সামগ্রী। কত বিশ্রব্ধ আলাপনে, কত প্রিয়সম্ভাষণে তাঁহাদের দিন রাত কাটিয়া যায়। কিন্তু সেই মধুর প্রেমের মধুরতার সহিত সতীর অধীনতা এবং স্বামীর দেবসম্ভ্রমও মিশ্রিত আছে। সখ্য-ভাবের সহিত ভক্তির মিলনই আর্য্য প্রেমের সৌন্দর্য্য। সখ্য-ভাবে তাহার মধুরতা, এবং ভক্তিতে তাহার পবিত্র কান্তি। মধুরতার সহিত এই সম্ভ্রমের মিলনে আর্য্যনারী এক অদ্ভুত রমণীয় সামগ্রী। শুশ্রূষাকালে স্বামী পরমপূজ্য দেবতা, কিন্তু আলাপনসময়ে তিনি পরম সখা। অর্য্যনারীর দম্ভ, অহঙ্কার ও অভিমান সকলই স্বামীর উপর। মানিনী স্বামীর শত আদরের ধন। মানিনীর জন্য রাজগৃহে মর্ম্মরনির্ম্মিত স্বতন্ত্র মানাগার প্রস্তুত থাকিত। কথায় কথায় আর্য্যনারীর অভিমান ও দর্প—প্রাণপতি

স্বামীর উপর দর্প ও মান। সমস্ত রাজ্য দিয়াও যদি মানভঙ্গ হয়, তাহাতেও আর্য্যপুত্র কুণ্ঠিত নহেন। দশরথ কত শত পরিতোষবাক্যে কৈকেয়ীর মানভঞ্জন করিতেছেন, বাল্মীকি তাহার উজ্জ্বল চিত্র দিয়াছেন। "চিত্রদর্শন" অঙ্কে সীতা কত মধুর আলাপে প্রিয়সখা রামচন্দ্রের সহিত স্বামিসুখ সম্ভোগ করিতেছেন, ভবভূতি উত্তরচরিতের প্রারম্ভেই তাহার সুন্দর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামচন্দ্র বিমানোপরি সীতাকে কত সুখালাপনে তাঁহাদের পূর্ব্ব পূর্ব্বকীর্ত্তিস্থল দেখাইয়া দিয়া যাইতেছেন, কালিদাস কেমন অতুলনীয় চিত্রে রঘুতে তাহা বর্ণন করিয়াছেন! এই সমস্ত দাম্পত্য প্রেমের সখ্য মধুরতার পরিচয়ে যে অপূর্ব্ব সুখানুভব হয়, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু সেই সখ্যমধুরতাসম্ভোগকালে সীতা রামচন্দ্রকে এমনি সসম্ভ্রমে কথা কহিতেছেন যেন, এখনি আবশ্যক হইলে, সেই রামচন্দ্রের তিনি পূজা করিতে পারেন। যে মানিনী কৈকেয়ী একদা সগর্ব্ব বচনে দশরথকে দারুণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, তিনিই তৎপূর্ব্বে দেবশুশ্রূষায় দশরথের পরম প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া বরলাভের যোগ্যা হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পায়ে ধরিয়া রাধিকার মান ভাঙ্গিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিতেন। ভক্তির সহিত সখ্য প্রেম মিলাইয়া আর্য্যনারী যেরূপে বিশ্রব্ধমনে স্বামিসম্ভোগ করেন, তাহারই প্রেমচিত্র আমাদের আর্য্যসাহিত্যে। তিনি আর্য্যসাহিত্যের পরম রমণীয় সৌন্দর্য্য। সেই সৌন্দর্য্যে একদা স্বর্গের পবিত্রতা, নন্দনকাননের শোভা এবং বসন্তের মধুরতা প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

বিলাতী প্রেম।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিরূপ দাম্পত্য প্রেমকান্তি? সেখানে স্রধুই সখ্যপ্রেম। সে সখ্যপ্রেমে আর্য্যনারীর ভক্তি নাই—সতীর সেই নিঃস্বার্থ, সেই একনিষ্ঠ, সেই নিরাকাঙ্ক্ষ, সেই পতি-গৌরবপরিপূর্ণ প্রেম নাই। সে প্রেমে সখ্যভাবের সেই বিশ্রব্ধ সম্ভাষণ আছে; সেই মধুরতা আছে; দর্প, অভিমান, আদর, সকলই আছে; কিন্তু তাহাতে আর্য্যসতীর সেই ভক্তিময় একনিষ্ঠ পুণ্যের প্রতিবিম্ব নাই, যাহাতে প্রেমকে পবিত্র ও দেবোচিত করে। তাহাতে মানবপ্রকৃতির আনন্দ আছে, কিন্তু দেবপ্রকৃতির সুষমা নাই। এই আনন্দময় নৃত্যের সহিত বিমল শোভার বিকাশ হইলে তবে সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা ঘটে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম-সৌন্দর্য্যের এই অসম্পূর্ণতা। এই প্রেম-সৌন্দর্য্য অনেক স্থলেই আবার ইন্দ্রিয়লালসার বিলাস-ক্ষেত্রে প্রস্ফুটিত। এইরূপ বিলাসক্ষেত্র সেই সাহিত্যের অনেক দেশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। সে সাহিত্যে প্রেমনদী বিলাসিতায় আবিল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। আসক্তিপরিপূর্ণ চঞ্চল কাম, প্রেম-নদীর বিশুদ্ধ স্রোতকে গৈরিকে কলুষিত করিয়াছে। রিপুর-প্রাবল্যে প্রকৃতিস্রোত ভাসিয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে প্রকৃতি রিপুরই দাসী হইয়াছে। মানবপ্রকৃতির পশুত্ব এত প্রবল যে, তথায় সেই প্রকৃতির দেবত্ব হীনবল হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই কথারই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

যে সীতাকে আমরা আর্য্যসাহিত্যে দেখিয়াছি, পাশ্চাত্যে সে সীতা কই? বাল্মীকির সীতার স্থানে পাশ্চাত্য সাহিত্যে

হোমরের হেলেন উদয় হন। অমনি ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়—স্বর্গের স্থানে নরকের চিত্র! সেক্সপিয়ার খুলিলে, তুমি পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহা অযথারূপে প্রেম বলিয়া উক্ত, সেই প্রেমছবি বিশিষ্টরূপে দেখিতে পাইবে। রোমিও প্রথমে রোসালিনের রূপে এত দূর মুগ্ধ যে, সেই হেতু তাঁহার কিছুমাত্র চিত্তের শান্তি ছিল না। তিনি দিবানিশি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেন ও অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেন। কিন্তু যেইমাত্র জুলিয়েট সুন্দরী তাঁহার নয়ন-পথের পথিক হইল, অমনি তিনি একবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেন। একরাত্রির মধ্যে এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। আবার জুলিয়েটের জন্য হৃদয়ের সেই অশান্তি। তিনি রিপুবলে তাড়িত হইয়া আবার জুলিয়েটের মন্দিরের চারি পার্শ্বে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে গোপনে তাঁহার গবাক্ষসম্মুখে উপনীত। ডেমিট্রিয়স হার্মিয়াকে দেখিয়াও তদ্রূপ; অমনি তাঁহার মন হইতে হেলেনা উপিয়া গেল। সেক্সপিয়ারের মত এমন উপিয়া-যাওয়া প্রেমচিত্র কেহ দিতে পারিবে না।

বাল্মীকি অগ্রে ধর্ম্মবীর রামচন্দ্রকে সাজাইয়াছেন, সাজাইয়া মানবের মনে এমন ধর্ম্মবীরত্বের অপূর্ব্ব চিত্র দিয়াছেন যে, সেই সৌন্দর্য্যে মানব মুগ্ধ। তখন আস্তে আস্তে ইন্দ্রিয়লালসার প্রতিমূর্ত্তি রাবণকে দেখাইলেন। ধর্ম্মবীরত্বে মোহিত মানব সেই রাবণের প্রতি স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত চাহিয়া দেখিলেন। তদ্রূপ, রামায়ণে অগ্রে সীতার পবিত্র এবং সুন্দর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। যে মন আগে সীতার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সে মন ইন্দ্রিয়পরায়ণা, কামানুমুগ্ধা ও নির্লজ্জা সূর্পনখাকে স্বভাবতঃই ঘৃণার সহিত অবলোকন করিবে। সুতরাং সূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদনের

সহিত সকলেরই স্বভাবতঃ সহানুভূতি ঘটে। এই চিত্র আর্য্য-সাহিত্যে। কিন্তু সেক্সপিয়ারের নাটক মধ্যে এরূপ ফল ফলে না। অগ্রে তাঁহার বড় বড় রিপুপ্রাবল্যের চিত্র। অগ্রে দিগ্‌গজ রাবণের চিত্র। সেই রাবণের উচ্চতায় আগে মন উঠে। তাহার স্বর্ণলঙ্কা ও মনোহর রাজ্যের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। ক্লিয়োপেট্রার বর্ণ-রাগে ও রাজসৌন্দর্য্যে মন মোহিত হয়। লেডি ম্যাকবেথে লোভের উচ্চতায় মন ভয়ানকে উন্নীত হয়। ইয়াগোর চাতুরীতে মন চমৎকৃত হয়। রিপুপ্রচণ্ডতার ঘোর চিত্রে মন এইরূপ স্তম্ভিত হইলে, সে মনে কি সেক্সপিয়ারের কমেডির সামান্য রিপুপ্রবল চিত্র রুচিবিরুদ্ধ বোধ হইতে পারে? তখন সবই এক বর্ণরাগে সমান বোধ হয়। প্রভেদ এই, এক দিকে বড় বড় চিত্রের প্রকাণ্ডতায় মন মুগ্ধ, অন্য দিকে তাহারই ক্ষুদ্র ছবি সকল ফটো-গ্রাফরাগে সুন্দর বোধ হইতে থাকে। এক ভূমিতেই এই দ্বিবিধ চিত্র অঙ্কিত। সেই ভূমির নাম রিপুপ্রবলা মানবপ্রকৃতি। ঘোর রিপুর প্রকাণ্ড চিত্রে অগ্রে যে রুচি সমঞ্জসীভূত হইয়াছে, সে রুচি কেন আর তাহারই ক্ষুদ্র চিত্রে বিরোধী হইবে? সেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিডি সমূহ হইতে একবার তাঁহার Tragi-comedy এবং Comedyতে অবতরণ কর।

সেখানেও সেই রিপুর প্রাবল্য ও ইন্দ্রিয়লালসা। তবে সেখানে মাত্রায় কিছু কম। সেখানে রোমিও জুলিয়েটের মত সাংঘাতিক রিপুর উচ্ছ্বাস নাই বটে, কিন্তু সেই রিপুর কিছু মন্দী-ভূত বেগ। সেখানেও যৌবনের উন্মত্ত নৃত্য ও অধীরতা, এবং ইন্দ্রিয়লালসার ঘোর প্রমত্ততা ও আবেগ। বেনিডিকের মনে যখন প্রেমতরঙ্গ উঠিল, তখন তাহার আবেগ দেখে কে?

বিয়েট্রিস অপেক্ষাও তিনি অধীর হইলেন। রোস্থালিণ্ড যৌবন-রাগে এত উন্মত্তা যে, অরল্যাণ্ডোর দুই ঘণ্টার অদর্শনে একেবারে অধীরা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, সেক্সপিয়ারের কমেডিতে প্রেমের চিত্র, যৌবনের উন্মত্ততা এবং ইন্দ্রিয়লালসায় এত কলঙ্কিত দেখায় যে, তাহাকে প্রকৃতপক্ষে প্রেমচিত্র বলিব, কি ইন্দ্রিয়লালসার চিত্র বলিব, এরূপ সন্দেহ জন্মে। সেই ইন্দ্রিয়লালসা ও যৌবন-মদে মাতিয়া নায়কনায়িকাগণ সামাজিক ও পারিবারিক শাসনের নৈতিক বাঁধ ভাঙ্গিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছেন। ডেসডিমোনা পিতৃশাসন অবজ্ঞা করিয়া, যৌবনমদে উন্মত্তা হইয়া, প্রকাশ্য আদালতে যেরূপ লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, জুলিয়েট এবং আইমজিনও তদ্রূপ পিতৃশাসনের অবজ্ঞাচিত্র। হার্মিয়া লাইসেণ্ডারকে লইয়া বনে পালাইয়া গিয়া তবে পিতৃশাসন ও রাজশাসনের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এক স্থানে সেক্স-পিয়ার এই উন্মত্ততা ও যৌবনলালসার চিত্র এইরূপ অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন,—

লোরেন্স। গগনে উজ্জ্বল শশী—এমনি নিশায়,
বায়ু যবে বহে ধীরে গাছের পাতায় ;
কিন্তু নাহি কোন রব—হেন নিশাকালে,
ট্রলয় উঠিয়া বলে, ট্রয়ের দে'য়ালে,
ফেলেছিল কত শ্বাস, যবন শিবিরে,
যথায় শায়িত তার ক্রেসিডা সুস্থিরে।

জেসিকা। এমতি নিশায় আর দলিয়া শিশিরে,
সভয়ে থিসিবি আগে গিয়া ধীরে ধীরে ;

দেখেছিল সিংহাকার কি যেন সম্মুখে,
অমনি সে পিছু ধায় ভয়ে কাঁপি বুকে।

লো। হেন নিশাকালে—ভীম সাগরের তীরে,
উ'লো ছড়ি হাতে ডিডো দাঁড়ায়ে অধীরে,
সঙ্কেতিয়া ডেকেছিল, প্রাণপ্রেয়সীরে,
একবার কার্থেজের পারে এস ফিরে।

জে। এমনি নিশায় আর সুন্দরী মিডিয়া,
নিজ হাতে ধনী কত ওষধি বাছিয়া,
তুলেছিল ঈশনেরে প্রাণদান দিয়া।

লো। হেন নিশাকালে আর জেসিকা সুন্দরী,
ইহুদীর তত ধন সব তুচ্ছ করি,
পালা'য়ে এসেছে ত্যজি ভেনিস নগরী,
অতৃপ্ত যৌবনরাগে বেল্মণ্টে আদরি।

জে। এমতি নিশায় আর লোরেন্স সুন্দর,
আদরেতে ধরি সেই প্রিয়ার অধর,
দিব্য করি বলেছিল কত ভালবাসে;
মন-চোর করে চুরি মিথ্যা সুধাভাষে। ইত্যাদি।

এই প্রেমসম্ভাষণ দৃশ্যটি সকল তরুণবয়স্কের নিকট অতি মিষ্ট লাগিবে, তাহা আমরা জানি; কিন্তু তন্মধ্যে যে যৌবনের উন্মত্ততার ছবি আছে—যে উন্মত্ততা সেক্সপিয়ারের সর্ব্বত্র—যে উন্মত্ততা কোনও গুরুজনের শাসন মানে না—যাহা সকল নৈতিক শাসনের অতীত—সেই দুর্দ্দম্য পাপছবি দিবার জন্য আমরা উক্ত সম্ভাষণটি অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। এইরূপ দুর্দ্দান্ত প্রেমের বশীভূত হইয়া জেসিকা সুন্দরী ধনবান ইহুদী পিতার গৃহ

হইতে লোরেন্সর কাছে বেল্‌মণ্টে পলাইয়া গিয়াছিল। এরূপ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় ঘটে বলিয়া, সেক্সপিয়ারের নাটকে তাহার এত ছড়াছড়ি দেখা যায়। হোমারের মহাকাব্যেও প্যারিসের সহিত হেলেনের ব্যভিচার ও পলায়ন। আমাদের তরুণবয়স্ক ছাত্রগণের সম্মুখে এরূপ চিত্র সর্ব্বদা ধরাতে তাহাদের কল্পনা নিশ্চয় দূষিত হইবারই সম্ভাবনা। তবে আর বিদ্যাসুন্দর পড়ায় এত দোষ কি ? সেক্সপিয়ার ইউরোপীয় প্রেমছবি তুলিতে গিয়া এইরূপ অনেক গুলি পাপচিত্র দিয়া গিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জনসমাজে "যার শেষ ভাল, তার সব ভাল" নামক নাটকের হেলেনার মত যে প্রেমের ভাল ছবি নাই, এমত নহে। কিন্তু তিনি সেরূপ চিত্র বড় অধিক ধরেন নাই। সেক্সপিয়ার-প্রমুখ কাব্য, নাটক ও উপন্যাস সমস্ত এই দোষে কলঙ্কিত। বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ চিত্রাঙ্কন করিলেই কি মানবপ্রকৃতি এত উজ্জ্বল হইয়া উঠে, না জনসমাজের প্রকৃত ফটোগ্রাফ দেওয়া হয় ?

পাশ্চাত্য জনসমাজে মানবপ্রকৃতির যেরূপ পাশব রীতি নীতি প্রচলিত আছে, সেক্সপিয়ার তাহারই যথাযথ চিত্র দিয়াছেন। সুধু সেক্সপিয়ার কেন, পাশ্চাত্য কাব্য ও উপন্যাসেও সেই একই চিত্র। সেক্সপিয়ার সর্ব্বশীর্ষস্থানীয় বলিয়াই তাঁহার নাটকাবলি পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। রূপ গুণের মোহ হেতু যে অনুরাগ জন্মে, সেই অনুরাগ যৌবনে কত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমরা তাহারই ছবি অঙ্কিত দেখি। কালিদাসে শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের প্রথম অনুরাগ তদ্রূপ রূপজ বটে, কিন্তু দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলাকে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মসংযমের পরিচয় দিয়া পাশব প্রবৃত্তির অনেক উচ্চে উঠিয়াছিলেন। শকুন্তলার রূপজ অনুরাগেও এমত একটি লজ্জাশীলতার আবরণ দেওয়া আছে, যে জন্য সেই চিত্রকে অতি মধুর করিয়াছে। সেরূপ মধুরতা আমরা পাশ্চাত্য প্রেমচিত্রে দেখিতে পাই না। সুধু যে মধুর করিয়াছে, এমন নহে, সেই চিত্র হইতে পাপের মলিনতা অপনীত হইয়াছে। কারণ, রূপজ অনুরাগ সেই স্থলেই পাপকলঙ্কিত, যে স্থলে তাহা অবৈধ রিপুরূপে পরিণত হয়। শকুন্তলার অনুরাগ প্রবল আসক্তিতে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই দুষ্মন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে বৈধ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্ববিবাহে রাজাদিগের বাধা নাই, এ জন্য দুষ্মন্তের বিবাহে তত দোষ স্পর্শে নাই।

কালিদাসের এই প্রেমচিত্রের কথঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহার সহিত পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমচিত্রের বিভিন্নতা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

"শকুন্তলা" নাটকখানি খুলিবামাত্র তোমার নয়নসমক্ষে এক অপূর্ব্ব প্রেমচিত্র উদিত হয়। শকুন্তলা কত প্রেম-পরিপূর্ণ হইয়া আশ্রমতরুগণের সেবায় নিয়োজিতা আছেন; কত স্নেহভরে আলবালে জলসেচন করিতেছেন! সখীগণ অসঙ্কুচিতচিত্তে অথচ সলজ্জভাবে কেমন পরস্পর প্রেমালাপ করিয়া আশ্রমদেশে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছেন! তাঁহাদের মনে যে পূর্ব্বানুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারা যে প্রণয়োন্মুখী হইয়া সহকারের সহিত মাধবীলতার বিবাহ দিয়া বসন্তে মুকুলোদ্গমের প্রতীক্ষায় উল্লাস করিতেছিলেন, এই চিত্র তাহারই সুন্দর পরিচয়। এমন

সময় দুষ্মন্ত দেখা দিলেন। দুষ্মন্তের সমক্ষে শকুন্তলার সলজ্জভাব ও মৌনাবলম্বন কালিদাস কেমন প্রকৃতিসঙ্গত চিত্রে অঙ্কিত করিয়াছেন! সেখানে ইউরোপীয় যুবতীয় ধৃষ্টতা ও বাচালতা নাই, অথচ শকুন্তলার সেই সলাজ নীরবতা বুঝি শতবাক্যে দুষ্মন্তের নিকট পূর্ব্বানুরাগের পরিচয় দিতেছে। এরূপ ভাব-বিকাশক নীরবতা কি কেহ কখন দেখিয়াছে? অথচ তাহা প্রকৃত আর্য্য যুবতীর ধর্ম্ম। তাহা জুলিয়েট বা আইমজিনের প্রগল্‌ভতা নহে। ক্রেসিডার জাল প্রেমবিকাশক বাক্যাবলি ও ক্রিয়াকলাপ, জুলিয়েট, আইমজিন, হেলেনা বা হার্মিয়ার সহিত সমান নহে বটে, কিন্তু এই প্রকৃত প্রেমিকাগণ যে নানা প্রগল্‌ভ বাক্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া আপনাদের হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এ দেশে অতি নির্লজ্জ-তারই পরিচায়ক। আর্য্য কুলাঙ্গনার তত দূর ধৃষ্টতা নাই। ইউরোপে সকলি সম্ভব; কারণ, সেখানে প্রেম ক্রয় বিক্রয় করিতে হয়। প্রেমশিকার (Courtship) করা রীতি ইউরো-পীয় সমাজে প্রচলিত থাকাতে, সেখানে পরের মন ভুলাইয়া রাজি করিতে হয়। সেখানে পতিলাভ নাই, পতিপত্নী শিকার করা আছে। সুন্দরী পত্নী লাভ করিতে হইলে, অর্ল্যাণ্ডোর মত রোসালিণ্ডের মন ভুলাইয়া তাহাকে শিকার করিতে হয়। সুতরাং অন্তরে যত দূর না থাকে, মুখে এবং বাহ্য ব্যবহারে তদপেক্ষা অধিকতর ভালবাসার পরিচয় দিতে হয়। এজন্য অনেকাংশে ভালবাসার ভাণ করিতেও হয়। ভালবাসি, ভালবাসি, প্রাণ যায়, ক্ষণেক অদর্শনও অসহ্য বলিয়া শত শত বার ভাল-বাসা জানাইতে হয়। অতৃপ্ত যৌবনের নেশা যত দিন প্রবল

থাকে, তত দিন ভালবাসার ভাষা অমৃতবচনে প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই সুধাময় বাক্যের মধ্যে কতটা মৌখিক, কতটা আন্তরিক, কতটা নেশার ঝোঁক, তাহা বুঝিবার যো নাই। অনেক সময়ে দেখা যায়, এক সুন্দরীর পর অন্য সুন্দরীকে দেখিয়া পূর্ব্বনেশা ও ভালবাসা রাতারাতি কাটিয়া গিয়াছে। যদি বল, স্বাধীনভাবে পছন্দ ও পাত্রাপাত্রনির্ব্বাচন করিয়া ত বিবাহ হয়। আমরা বলি, তেমন পূর্ণ ও অতৃপ্ত যৌবনকালে নির্ব্বাচনের কথা আসিতেই পারে না। যৌবনে নির্ব্বাচন হয় না, তখন কেবল রিপুর জোর ও চক্ষের নেশা। যাহাকে নির্ব্বাচন বল, তাহা নেশা, বা রিপুরই প্রতিবাক্যমাত্র। নিজে সেক্সপিয়ার সেই কথাই বলিয়াছেন। Friar রোমিওকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"————Young men's love then lies
not truly in their heart, but in their eyes."

হার্মিয়ার বিবাহের জন্য তাহার পিতা ডেমিট্রিয়সকে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; কিন্তু হার্মিয়া চান লাইসেণ্ডারকে। রাজার নিকট আবেদন হইল। হার্মিয়া বলিলেন যে, পিতা যদি আমার চক্ষে দেখিতেন, তবে অবশ্য লাইসেণ্ডারকেই মনোনীত করিতেন।

"Hermia—I would my father look'd but with
my eyes"

এ কথার উত্তরে রাজা বলিতেছেন,—তোমার চক্ষু কোথায়? তুমি ত অন্ধ। তোমার উচিত, তোমার পিতার চক্ষে দেখা।

"Theseus—Rather your eyes must with his
Judgment look."

তবেই দেখা যাইতেছে যে, যেখানে নির্ব্বাচনের শক্তি নাই, যেখানে রিপুর অন্ধতাই প্রবল, সেখানে পিতা মাতার নির্ব্বাচনেই সম্মত হওয়া উচিত। এই কারণে, আর্য্যজাতির মধ্যে যে বিবাহসূত্রে পাত্র ও পাত্রীকে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থাকিতে হয়, সে কার্য্যে বরকন্যার নির্ব্বাচন পিতামাতা বা অন্য সুবিজ্ঞ অভিভাবকের হস্তেই সমর্পিত হইয়াছে। আপনার বিবাহের জন্য যখন লালায়িত হইতে হয় না, তখন আর দোকানদারি করিয়া প্রেমশিকার করিবার আবশ্যকতা কি? আর্য্যসমাজে স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা এজন্য স্বাভাবিক অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সেই লজ্জাশীলতা কেমন মধুর, তাহা শকুন্তলায় প্রতীয়মান!

শকুন্তলা ও মিরান্ডা।

শকুন্তলা যেমন সংসার হইতে দূরস্থিতা হইয়া বনমাঝে ঋষির আশ্রমে পালিতা হইয়াছিলেন, তিনি সেই আশ্রমবাসিগণ ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতেন না; সেক্সপিয়ারের মিরান্ডাও তেমনি এক নির্জ্জন দেশে একাকিনী পিতার নিকট পালিতা হইয়াছিলেন। শকুন্তলার যৌবনরাগে যখন প্রেমোদ্রেক হইয়াছিল, সেই সময়ে দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহার যে স্বাভাবিক নীরব সলজ্জ ব্যবহার, তাহার বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিয়াছি। কিন্তু সেক্সপিয়ার তদনুরূপ স্থানে মিরান্ডার কিরূপ ব্যবহার দেখাইতেছেন? তিনি তাঁহার পিতা ভিন্ন জনসমাজের মুখ দর্শন করেন নাই, কিন্তু যখন Ferdinand তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইল, তখন তিনি যেন ঘোর সংসারিণীর ন্যায় তাহার

সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। শকুন্তলার সাক্ষাতে দুষ্মন্তই গন্ধর্ব্ব-বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে কি হইতেছে, দেখুন ;—

মিরাণ্ডা।—তুমি কি আমাকে ভালবাস ?

ফার্ডিন্যাণ্ড।—আমি সর্ব্ব দেবদেবী ও পৃথিবী, সর্ব্বসমক্ষে বলিতেছি, শপথ ও সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি যে শুধু তোমায় ভালবাসি, এমন নহে ; তোমাকে অতি সম্ভ্রান্ত কন্যারূপে সম্মান করি ; তোমার গৌরব কত, তাহা জানি না।

মি—তবে, যাহাতে আমি হাসিব, তাহাতে কাঁদি কেন ?

ফা—কেন তুমি কাঁদ ?

মি—আমি কাঁদি, আমার হীনতা ও দীনতা বুঝিয়া। আমি তোমাকে যাহা দিব, তাহা তুমি যে গ্রহণ করিবে, এমন ভরসা আমার নাই ; কিম্বা তোমার যাহা না পাইলে আমি মৃতপ্রায় হইব, তাহা যে তুমি দিবে, এমন আশাও করি না ; সেই জন্য কাঁদি। কিন্তু এ সব তুচ্ছ কথা ! যাহা আমি ঢাকিতে চাহিতেছি, তাহা যেন সুস্পষ্ট বাহির হইয়া পড়িতেছে। লজ্জা ও চাতুরীতে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া সরলভাবে বলি, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আমি তোমার পত্নী হইব। যদি না কর, আমি তোমার চিরদাসী হইয়া থাকিব।

ফা।—তুমি আমার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা। আমি কি তোমার যোগ্য !

মি। তবে তুমি আমার প্রাণবল্লভ পতি।

এত কথা, বাক্‌চাতুরী ও মনোমোহন বাক্য মিরাণ্ডা কোথা হইতে শিখিলেন ? তিনি না বলিয়াছিলেন, আমি কখন নর-

লোকের মুখদর্শন করি নাই। তিনি না জনহীন দ্বীপে তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে আনীত হয়েন? সেখানে তাঁহার পিতা ব্যতীত আর কাহারও মুখ বার বৎসর দেখেন নাই। তবে সেই বনবাসিনী ষোড়শীর মুখে এত বাক্‌ছলা কোথা হইতে আসিল? শকুন্তলার ঋষিআশ্রমে তবু ত একপ্রকার জনসমাজ ছিল। সেখানে সেই ঋষির শিষ্যগণ ও গৌতমী ছিলেন; অনসূয়া প্রিয়ম্বদা সখীদ্বয় ছিল, আর প্রাচীনকালে মুনিগণের আশ্রমে কে না আসিত? তথাপি শকুন্তলারও মুখে এত কৌশলের বাগ্‌ভঙ্গী শোভা পাইত না। সেই শকুন্তলা সাহসিনী হইয়া অগ্রে দুষ্মন্তের কাছে কোনও কথা কহেন নাই। দুষ্মন্ত অগ্রে বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন। তুলিলেও শকুন্তলা দুষ্মন্তের নিকট তত কৌশলে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেন না। শকুন্তলা বরাবর লজ্জাশীলা ও নতমুখী হইয়াছিলেন। মানবপ্রকৃতি ত সর্ব্ব স্থানেই সমান। মিরাণ্ডা ত পাশ্চাত্য জনসমাজে শিক্ষিতা হয়েন নাই যে, তিনি সেই সমাজের ধরণ ধারণ অনায়াসে অনুকরণ করিবেন, বা সেই সমাজস্থা বয়স্কা কুমারীগণের ন্যায় বাগ্‌নিপুণা হইবেন। সেক্সপিয়ার বোধ হয় নিজ অভ্যাসবশতঃ যাহা জুলিয়েটে, রোজালিণ্ডে, বিয়াট্রিমে, আইমজিনে, ডেসডিমোনায়, হার্মিয়া প্রভৃতি চতুরাগণে দিয়াছিলেন, তাহা মিরাণ্ডায় আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হয়েন নাই। শকুন্তলার ব্যবহারের মত সরলতা, লজ্জাশীলতা, অথচ স্বাভাবিক যৌবনসুলভ প্রেমপরিচয়ের চিত্র, সেক্সপিয়ারের পাশ্চাত্য সমাজে অত্যন্ত বিরল। সুতরাং তাহা কল্পনায় আনাও বড় সহজ কথা নহে। মানব প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্য কেবল আর্য্য সাহিত্যেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মির‍্যাণ্ডা সরলতায় সাহসিনী। লজ্জা কি, লজ্জার ব্যবহার কিরূপ, মির‍্যাণ্ডা কখন দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয়ে যখন যাহা উদিত হইত, তখন তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন: মনের আবেগ তিনি ঢাকিতে জানিতেন না। এই সরলতায় সুতরাং তাঁহার মনের ভাব দর্পণের মত দেখা দিত। তাই যদি হয়, তবে ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মির‍্যাণ্ডার সম্ভাষণকে অবশ্য সরলতার পরিচয় ও স্বাভাবিক বলিতে হইবে। হৃদয়াবেগে যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা অবশ্য অকৃত্রিম ও সরলভাষা। ফার্ডিন্যাণ্ডের সহিত মির‍্যাণ্ডার কথাবার্ত্তা যদি স্বভাবোক্তি হয়, তবে কথা এই, মির‍্যাণ্ডার সেরূপ স্বভাব সম্ভব কি না? মিরাণ্ড্যার মুখে এত ভালবাসার কথা, বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার চরিত্রের এত অধীরতা এবং মনের আবেগ গোপন করিবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিতে যাইতেছিলেন, বলিয়াছিলেন, এই লুকাচুরি ভাব তাঁহার মত জনসমাজবিদূরিতা সরলা যুবতীর চরিত্রে কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, আমরা বুঝিতে পারি না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"Hence bashful cunning."

সেই "সলজ্জ চাতুরী" তিনি কিরূপে জানিলেন? সলজ্জ চাতুরী দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার তিনি বলিতেছেন,—

"And prompt me plain and holy innocence."

তিনি চাতুরীর সহিত "সরলতার" প্রভেদ শিখিলেন কোথা হইতে? সেই সরলতার পবিত্রতা বুঝিলেন কিরূপে? আবার ফার্ডিন্যাণ্ডকে কিরূপ ধরিয়া বসিয়াছেন দেখুন,—

"I am your wife, if you will marry me.
If not, I'll die your maid : to be your fellow

You may deny me ; I 'll be your servent,
Whether you will or no."

মিরাণ্ডার স্বাভাবিক হৃদয়াবেগপ্রকাশে এত বাক্‌চাতুরী, তাঁহার মত নির্জ্জনপ্রস্থিতা সরলা ললনায় শোভা পায় না,—সম্ভাবিতও নহে। সেই সম্ভাষণে তাঁহার যৌবনসুলভ হৃদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়লালসা কেমন বিশদরূপে প্রকটিত! মিরাণ্ডা বিবাহের নিমিত্ত তেমনি অধীরা, যেমন ফার্ডিন্যাণ্ড। শূর্পণখার অধীরতা ও জিদের সহিত মিরাণ্ডার প্রভেদ কি? যৌবনমদের এই উন্মত্ততা ও অধীরতার চিত্র সেক্সপিয়ারে। মিরাণ্ডা ইন্দ্রিয়লালসার প্রাবল্য ও অধীরতা দেখাইবার অতি স্বচ্ছ দর্পণ।

কবির আদর্শ সৃষ্টি।

সেক্সপিয়ার যেমন মানবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি আসুরিক এবং পাশব রিপুগণের পরাকাষ্ঠা ও অসামান্য প্রাবল্য চিত্রিত করিয়াছেন, * আর্য্যকবিগণ তেমনি প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগণের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। সচরাচর সংসারক্ষেত্রে তত দূর রিপুবৎ স্ফূর্ত্তি অতি দুর্ল্লভ। লেডি ম্যাকবেথ যেমন দুর্ল্লভ, সীতা সাবিত্রীও তেমনি দুর্ল্লভ। কিন্তু কবির সৃষ্টি দুর্ল্লভ নহে। কবি কল্পনা-রাজ্যে আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানবের চরমোৎকর্ষ দেখাইতে পারেন।

---

* সেক্সপিয়ারকে উল্লেখ করিয়া যাহা বলা হইল, তাহা সেক্সপিয়ারের আদর্শাবলম্বিত সমস্ত কাব্য ও উপন্যাস সম্বন্ধেও সত্য। সেক্সপিয়ার এই কাব্য ও ঔপন্যাসিক সাহিত্যের অধিনায়কমাত্র।

মানবের কল্পনাসমক্ষে সেই আদর্শ ধরিবার জন্যই কাব্যের সৃষ্টি। নহিলে সচরাচর পৃথিবীতে যাহা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জন্য আবার কাব্য সৃষ্টির আবশ্যকতা কি? তাহা ত মানবের সমক্ষে সর্ব্বদাই রহিয়াছে। কবি তদুপরি উঠিয়া অসামান্য আদর্শের সৃষ্টি করেন। সেই আদর্শ মানবমনে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া তাহার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে, এবং প্রবৃত্তিগণকে সৎপথে নিয়োজিত করে। এইরূপ আদর্শের সৃষ্টি আর্য্যসাহিত্যের সীতা সাবিত্রী প্রভৃতি সতীগণ।

সেক্সপিয়র জুলিয়েটে দেখাইলেন যে, এ সংসারে সামাজিক, পারিবারিক ও বিবাহের বন্ধন ছেদন করিতে না পারিলে, নিজ রিপু চরিতার্থ করা যায় না। আর্য্যকবিগণ দেখান যে, সংসারের সমস্ত বন্ধন ও শাসনের অধীন হইয়া যে প্রেমের স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই প্রেমের নৈতিক সৌন্দর্য্য ও চরম উৎকর্ষ। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু সর্ব্বলোকসাধারণ। সেই রিপুগণকে প্রবল হইতে না দেওয়াই মনুষ্যত্ব। আর্য্যসমাজ ও সাহিত্যে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

সাহিত্যে প্রেম।

(মনুষ্যত্ব)

মনুষ্যত্ব কি ?

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে কেমন দেবত্বের সৃষ্টি এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রেমে কেমন পাশব ভাব। মানবপ্রকৃতি যেমন পাশবপ্রবৃত্তির আধার, তেমনি দেব-প্রবৃত্তির লীলাভূমি। মানব যত দেবভাবে সমুন্নত হইতে থাকে, তাহার পাশবপ্রবৃত্তি ততই তিরোহিত হইতে থাকে। ধর্ম্মব্যাধ বলিয়াছিলেন, যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ কল্যাণকর পুণ্যকর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে। ইউরোপীয় সাহিত্য পাশবপ্রবৃত্তিকে দমন করিতে যত শিক্ষা দেয়, দেবপ্রকৃতির স্ফূর্ত্তিসাধনোদ্দেশে অন্তরকে তত উত্তেজিত করে না। আর্য্যসাহিত্য বলে, এই পাশবপ্রবৃত্তি শাসন করিবার দ্বিবিধ উপায় ;—(১) পাপের ভীষণ পরিণাম দেখিয়া তাহা পরি-ত্যাগ কর, এবং (২) পুণ্যের স্ফূর্ত্তি সাধন করিয়া পাপপথ হইতে নিবৃত্ত হও। আর্য্যসাহিত্য দেখাইয়া দেয়, যত অধিক পুণ্যের সঞ্চার হইবে, সেই পরিমাণে পাপ আপনা-আপনি দূরে যাইবে। পুণ্যের ও দেবত্বের উচ্চ আদর্শে অন্তরকে উত্তোলিত করিয়া পাপকে বিদূরিত করিবার জন্য আর্য্যকবিগণের রচনাকৌশলের বিস্তৃত সৃষ্টি। এই উচ্চাদর্শে অন্তরকে নিয়োজিত করাই মনুষ্যত্ব।

পাশবপ্রবৃত্তিসমূহ মনুষ্যে এত প্রবল যে, স্বভাবতঃই মনুষ্য পাশব ব্যবহারে নিরত হয়। অন্য দিকে তাহার দেবাংশ তাহাকে দেবসৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট করে। তাহার পাশব কার্য্য সকল দুঃখপ্রধান, এবং দেবকর্ম্মসমূহ সুখপ্রধান। এই সুখ আবার এত দীর্ঘকালস্থায়ী যে, তাহার সহিত তুলনায় পাশবপ্রবৃত্তিজনিত সুখ কিছুই নহে বলিলে হয়। পাশবপ্রবৃত্তি সুখদুঃখের প্রসূতি, কিন্তু দেবপ্রবৃত্তি শান্তির জননী। এই শান্তিলাভের জন্য লালায়িত হইয়া মনুষ্য পাশবপ্রবৃত্তিসুখ পরিহার করিতে উদ্যত হন। বিবেচনা, চিন্তা ও বিচারশক্তি তাঁহার বুদ্ধিকে সদুপায় দেখাইয়া দেয়। এই সদুপায়ের নির্দ্ধারণে এবং অবলম্বনে তাঁহার মনুষ্যত্ব। মানব এইখানে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের এই উপায় অনায়াসলব্ধ এবং স্বাভাবিক বলিয়া, মনুষ্য দেবতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট। যাহার পক্ষে এই উপায়াবলম্বন যত সহজ ও অনায়াসলব্ধ, তিনি তত দেবোপম,—তাঁহার দেবশক্তি তত স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। আর্য্যসমাজে এরূপ রীতিনীতি প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে, যদ্দ্বারা এই উপায় সকল অবলম্বিত হইতে পারে। আর্য্যসমাজ ও তাহার রীতিনীতি এই জন্য মনুষ্যত্বলাভের অনুকূল। সেই রীতিনীতিতে পশুত্বের পরিহার এবং দেবত্বের অবলম্ব। তজ্জন্য যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযম আর্য্যসমাজের প্রধান বল ও নীতি। যে পরিমাণে এই বলোপচয় হইবে, সেই পরিমাণে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা। কারণ, দেবত্বের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আর্য্যসমাজের রীতিনীতির দৃঢ় বন্ধন। এই বন্ধন ছেদন করা যাহা, আর দেবত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে যাওয়াও তাহা। এই বন্ধনসমূহের অনুগামী হইয়া যিনি সংযমী হইতে পারেন, তিনি নিশ্চয় দেবত্বের অধি-

কারী হইতে সমর্থ। এই বন্ধনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করাতে যে সংযমের প্রয়োজন, সেই সংযমের সাধনাই মনুষ্যত্ব। আর্য্য-সমাজে এই মনুষ্যত্বের বিকাশ।

সতীত্ব-গৌরবের ধর্ম্মবল।

পূর্ব্বকালে সতীর গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া আর্য্যনারী কেমন বীরত্ব ও সংযমের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের আর্য্যসাহিত্যে পরিদৃশ্যমান। সেই গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহারা নিজ পবিত্রতা-রক্ষার্থ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কাতর হইতেন না। কত রাজপুত বীরাঙ্গনা যবনস্পর্শভয়ে ভীতা হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণদান করিয়া গিয়াছেন। স্বামিগরিমায় উন্মত্তা সতী পলমাত্রও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে চাহিতেন না। যাঁহার সেই গরিমা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইত, সেই বীরাঙ্গনা সতী সহমরণেও ভীতা হইতেন না; স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে চিতারোহণ করিতেন। যে আন্তরিক বলে এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত, সে বল কি সামান্য? সেই বলে আর্য্যসতী বলবতী হইয়া সংসারধর্ম্মে আত্মসংযমের সম্যক্ পরিচয় দিতেন। স্বামীর নিমিত্ত সকল কষ্টভোগ ও সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারিতেন। সতীত্বগৌরব এক্ষণকার কালে যত অন্তর্হিত হই-তেছে, সেই বলও ততই অদৃশ্য হইতেছে। কিন্তু সেই প্রবর্ত্তনার পরিবর্ত্তে কি আমরা আর কোন সমপ্রবল উত্তেজনশক্তি আমা-দিগের স্ত্রীজাতিকে দিতে পারিয়াছি? যদি না দিতে পারিয়া থাকি, তবে সেই পূর্ব্বতন সতীত্বগৌরব তাহাদিগের মন হইতে অপনীত করি কেন? আর কোন প্রবর্ত্তনা যে তত বলবতী

হইতে পারে, তাহা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। কিন্তু যাহার পরিচয় আর্য্যসাহিত্যে আছে, সেই প্রবর্ত্তনার বল অত্যন্ত অধিক বলিয়াই দেখা গিয়াছে। তাহাকে আর পরীক্ষা করিতে হইবে না। সুতরাং সেই প্রবর্ত্তনাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখাই উচিত। সেই উত্তেজনশক্তি যদি নারীসমাজকে বলপ্রদান করে, সে বল পর্ব্বতের মত অলঙ্ঘ্য। সেই অলঙ্ঘ্য বলে বলবান আমাদের নারীসমাজের ধর্ম্মনৈতিক বলের সমতুল্য বল আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অতএব আমাদের সমাজে পূর্ব্বতন সতীত্বগৌরব যাহাতে সুরক্ষিত হয়, এমন উপায় অবলম্বন করা এবং যদ্দ্বারা সেই গৌরবের হ্রাস হয়, তাহার পরিহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

রমণীর সংযম-বল।

এই সতীত্বগৌরবরক্ষার্থ রামজননী কৌশল্যা দেবী আত্মসংযমের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। স্বামী, কৈকেয়ীর বশতাপন্ন হওয়াতে, সাধ্বী চিরকালই একান্ত মনঃকষ্টে কালাতিপাত করিয়াছিলেন; কৈকেয়ী এবং তাঁহার দাসী পর্য্যন্ত কত অপমান ও বিদ্রূপ করিয়াছিল। তবু কৌশল্যা দশরথকে ভালবাসিতেন। ভাবিয়াছিলেন, পুত্রের রাজত্বকালে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইবে। সেই রামাভিষেককাল সমুপস্থিত। কৌশল্যার অন্তরে শত চন্দ্রের উদয় হইল। কিন্তু তৎপরেই যখন রাম বনবাসে যাইবার নিমিত্ত মাতৃবিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন, কৌশল্যার অন্তর একেবারে শতধা বিদীর্ণ হইল। তাঁহার কোন দিকে আর কোন সান্ত্বনা রহিল না। প্রবল অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয়ে শত সমুদ্র উছলিয়া

উঠিল। তিনি কিরূপে গৃহে তিষ্ঠিবেন ? কৌশল্যার সুখ অযোধ্যায় নাই,—তাঁহার সুখ রামের সঙ্গে বনবাসে। কৌশল্যা মনের দারুণ আবেগে রামের সঙ্গে বনে যাইতে চাহিলেন; কিছুতেই গৃহে থাকিবেন না। তখন রামচন্দ্র তাঁহাকে যেইমাত্র সতীর কর্ত্তব্যের দিকে দেখিতে বলিলেন,—পিতৃদেব দশরথ জীবিত থাকিতে তিনি ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে পারেন না, অমনি কৌশল্যা দেবীর চমক ভাঙ্গিল। মনের দারুণ আবেগ, কর্ত্তব্যের বলে তিনি প্রতিরোধ করিলেন। এক দিকে দারুণ অপত্যস্নেহ, অন্য দিকে স্বামীর প্রতি অনুরাগ, তন্মধ্যে সতীর কর্ত্তব্যজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্তব্যবুদ্ধি আত্মসংযম আনিয়া দিল। আর কৌশল্যা দশরথকে পরিত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গে বনবাসে যাইতে পারিলেন না। প্রেমের এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গকে সংযত করিল। সতীর অনুরাগ অপত্যস্নেহের উপর বিজয়ী হইল। সতী দশরথসেবায় আবার নিযুক্তা হইলেন।

রামবনবাস পিতৃনিয়োজিত; লক্ষ্মণ কেন বনবাসে যান ? তথাপি সুমিত্রা দেবী ত কাঁদিয়া অধীরা নহেন ? তাঁহার ধৈর্য্য বুঝি আরও চমৎকার। সুমিত্রার বিষাদ কি কেহ টের পায় ? সুমিত্রার আত্মসংযম অন্তরে অন্তরে তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়াছিল। কিন্তু সতী সে সংগ্রাম গোপন রাখিয়া অতি বিশ্বস্ত চিত্তে লক্ষ্মণকে অকাতরে বিদায় দিয়া গৃহধামে পতিপার্শ্বেই রহিলেন।

আত্মশাসন দেখ সেক্সপিয়রের ইস্তাবেলায়। ইস্তাবেলা সমুদায় সাংসারিক প্রেম সংযত করিয়া তাহা ভগবানে সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাঁহার মানুষপ্রেম দেবপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল। আর্য্যবিধবার সমস্ত সংসারাসক্তি যেমন দেবতায় নিবেদিত হয়,

ইস্যাবেলার সংসারাসক্তি বুঝি সেইরূপই নিবেদিত হইয়াছিল। ইস্যাবেলা সেইরূপ দেবপ্রেমে পরিপূর্ণা হইয়া ধর্ম্মমঠে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন। তখন সেই নবীন তপস্বিনীর যৌবনানুরাগের উচ্ছ্বাস দেখে কে? এই দেবপ্রেমের ছবি সেক্সপিয়ার কেবল ক্যাথলিক খৃষ্টধর্ম্মে পাইয়াছিলেন। সেই ধর্ম্ম বৌদ্ধমঠের নিয়ম গ্রহণ করিয়া ইউরোপীয় সমাজে তাহা কেমন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, আধুনিক ইউরোপীয় উদারচেতা সমালোচকগণ তাহা দেখাইয়াছেন। সে যাহা হউক, নবীন তপস্বিনী ইস্যাবেলা নিজ ভ্রাতার প্রাণরক্ষার্থ ঘোর নিশীথে একাকিনী এঞ্জিলোর নিকট দ্বিতীয় বার উপস্থিত। এঞ্জিলো তখন স্বীয় পাপাভিলাষ প্রকাশ করিলে ইস্যাবেলা ধর্ম্মকোপে প্রজ্বলিত হইয়া বলিয়াছিলেন:—

"যায়, ভাই যা'ক, তথাপি তাহার প্রাণরক্ষার্থ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত ভগ্নী কখনই অধঃপাতে যাইতে পারিবে না।"

আবার যখন সেই ভাই আত্মরক্ষার্থ ভগিনীকে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল, তখন ইস্যাবেলা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন;—

"রে দুর্বৃত্ত নরাধম! ভগিনীকে পাপে লিপ্ত করিয়া তোর বাঁচিবার সাধ, ধিক তোরে!"

এই দুই স্থলে ইস্যাবেলা নিজ ধর্ম্ম ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আত্মসংযমের সুন্দর পরিচয় দিয়াছিলেন। ইস্যাবেলার অন্তর যখন ধর্ম্মরাগে পরিপূর্ণ ও পরিপূত হইয়াছে; যখন তিনি সেই নবরাগে মঠে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি যে এঞ্জিলোকে প্রত্যাখ্যান করিবেন, এ বড় বিচিত্র নহে। তাঁহার তখনকার মনোবেগের সমক্ষে পাপপ্রবৃত্ত এঞ্জিলো কি দাঁড়াইতে

পারেন? এরূপ চিত্র সেক্সপিয়ারে অধিক পরিমাণে থাকিলে সেক্সপিয়ার বড়ই উপাদেয় হইত।

কীচকের প্রলোভনে দ্রৌপদীর এই প্রকার আত্মসংযম। দ্রৌপদী আত্মসংযম করিয়া কীচকের কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই জানেন।

পুরুষের সংযম।

আর, আত্মশাসন দেখ ভরতের। ভরতের জন্য অযোধ্যার সিংহাসন প্রস্তুত; তাঁহার মাতা সকল কণ্টক কাটিয়া রাজসিংহাসন তাঁহার পদতলে দিয়াছিলেন। কিন্তু ভরত কি সেই সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন? তিনি নিজ মাতার ব্যবহার সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের বনবাসে সেই সিংহাসন ক্রীত হইয়াছিল। পিতৃদেব দশরথের তজ্জন্য প্রাণবিয়োগ হইয়াছে; সমস্ত পরিজনবর্গের রোদনরোল উত্থিত হইয়াছে; অযোধ্যাবাসিগণ রামের জন্য হাহাকার করিতেছেন। তখন ভরত কি সিংহাসনে বসিতে পারেন? তখন না হয়, তার পরেও কি তিনি রাজমুকুট ধারণ করিতে পারেন? তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি উত্তেজিত হইল। সেই ভ্রাতৃভক্তিবশে তিনি জননীকে ভর্ৎসনা করিলেন; সিংহাসনের লোভ সম্বরণ করিলেন। যখন রাম তাঁহার আহ্বানে—তাঁহার অনুনয় বিনয়ে—গৃহে ফিরিয়া আসিলেন না, তখন তিনি সেই সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন করিয়া, যে রাজকার্য্য না করিলে নয়, সেই রাজকার্য্যে অনাসক্ত হইয়া ব্যাপৃত হইলেন। এক দিকে অগ্রজের পাদুকা পূজা করি-

তেন, অন্য দিকে তাঁহার হইয়া রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এই আত্মসংযমবলে ভরত যাহা করিলেন, তাহাতে ভরতকে, রাজসিংহাসন কি তুচ্ছ, দেবাসনে বসাইয়াছে। অযোধ্যায় রাজা হইলে ভরতের কি হইত? আজি ভরত সর্ব্বজনের ও সর্ব্বকালের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি তাঁহাকে দেবোপম করিয়াছে।

আর আত্মশাসন দেখ কচের। কচ শুক্রাচার্য্যগৃহে সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিখিতে গিয়াছেন। দেবযানী তাঁহার সংসর্গ ভালবাসিতেন। সমস্ত দিন দুই জনে একত্র থাকিতেন। কচের রূপ ও গুণে দেবযানী মুগ্ধা। দেবযানীর অনুগ্রহে তিনি চার বার মৃত-সঞ্জীবিত হইয়াছেন। কচ তথাপি দেবযানীর পাপস্পৃহার পক্ষ-পাতী নহেন। কচ দেবযানীর মনোভিলাষ বিলক্ষণ জানিতেন; সেই জন্য তিনি গুরুকন্যাকে ভগ্নীভাবে দেখিতেন ও সম্বোধন করিতেন। অবশেষে কচ যখন নিজ ইষ্টলাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত, দেবযানী তখন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। মুনির নিকট দেবযানী আত্মপ্রকাশ করিলেন। কচ তাঁহাকে অসামান্য আত্মসংযমবলে প্রত্যাখ্যান করিলে, দেবযানীও আত্মশাসন করিয়া নিজ অভিলাষ সংযত করিলেন। চন্দ্র ও তারার প্রেমে এবং সেক্সপিয়ারের আইমজিন, হেলেনা, ডেসডিমোনা, জুলিয়েট প্রভৃতির প্রেমে যে আত্মশাসনের অভাব, সেই আত্মশাসনপ্রভাবে কচ ও দেবযানীর প্রেমচিত্র দেব-সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়াছে; ইন্দ্রিয়লালসার পাপান্ধকার তিরোহিত হইয়াছে। সেক্সপিয়ার এবং তদনুবর্ত্তী শত শত উপন্যাসলেখকের রচনায় প্রেমের এরূপ দেবপ্রতিম শাসন কি লক্ষিত হয়? পশুত্ব

কি দেবত্ব দ্বারা অনুশাসিত হয়? সেই অনুশাসনের বল আত্ম-শাসন ও মনুষ্যত্ব।

প্রেম, ভক্তিতে সংযত।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমচিত্রসকল এই আত্মসংযমপ্রভাবে গৌরবান্বিত। প্রেম কেমন আত্মশাসন ও ভক্তিতে অনুশাসিত, তাহা যদি দেখিতে চাও, তবে একবার শুধু কৌশল্যাকে কেন, বাল্মীকির সীতা ও সুমিত্রা দেবীকে দেখ। দেখ ব্যাসের দ্রৌপদী, কুন্তী ও গান্ধারীকে। অরুন্ধতী, সাবিত্রী ও দময়ন্তীকে দেখ। দেবযানী, শর্ম্মিষ্ঠা ও শকুন্তলাকে দেখ। রাধিকা, রমা ও উমাকে দেখ। সুভদ্রা, রুক্মিণী ও সত্যভামাকে দেখ। দেখ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নকে। আত্মশাসন দেখ, রাজসভায় আনীতা শকুন্তলার সমক্ষে দুষ্মন্তচরিত্রে। আর যদি আত্মশাসনের প্রকাণ্ড ছবি দেখিতে চাও, তবে একবার মহাভারতে যে স্থলে কুরুসভায় দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা হইতেছে, সেই স্থলে পঞ্চপাণ্ডবের পানে চাহিয়া দেখ। ভীম আক্রোশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন,—একবার যুধিষ্ঠিরের সঙ্কেত পাইলে হয়, অমনি পৃথিবী রসাতলে দেন। অর্জ্জুন বীরত্বে ফুলিয়া উঠিয়া কোপপ্রজ্বলিতনয়নে যুধিষ্ঠিরের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—আর দেখিতেছেন—একদৃষ্টিতে দেখিতেছেন—কতক্ষণে তাঁহার শির একবার নড়িয়া উঠিবে—কতক্ষণে অগ্রজ একবার মুখোত্তোলন করিয়া ইঙ্গিত করিবেন—আর তিনি অমনি সেই কুরুসভা চুরমার করিয়া ফেলিবেন। যদি আত্মশাসন দেখিতে চাও, যদি ধৈর্য্য দেখিতে চাও, যদি

ভ্রাতৃভক্তির বল দেখিতে চাও, একবার সেই দিকে দেখ। দেখ সম্মুখে নিজ পত্নীর লাঞ্ছনা—সমুদায় শত্রু কর্ত্তৃক ঘোর লাঞ্ছনা; আর গাত্রে অপরিসীম বল, বিক্রম ও বীর্য্য। উষ্ণ শোণিতে আপাদমস্তক জ্বলিতেছে। শত্রুগণ সদর্পে হাসিতেছে। দ্রৌপদী রাগে ও অপমানে ভীম ও অর্জ্জুনের প্রতি চাহিয়া আছেন। তথাপি ভ্রাতৃভক্তি, ধৈর্য্য ও আত্মশাসনের গণ্ডী কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিল না। দ্রৌপদী ভগবানের পদে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। ভগবান দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিলেন। এই আত্মশাসনের চিত্র, পৃথিবীর কোন্ কবি ধরিতে পারিয়াছেন?

এইরূপ ভূরি ভূরি প্রেমাদর্শ আমাদের আর্য্যসাহিত্যে। সে প্রেম ভক্তিতে সমুন্নত এবং স্নেহরসে বিগলিত। সীতার প্রেম পতিভক্তিতে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে একদা প্রেম ও ভক্তির পরিচয়। তেমন প্রেম-মাখা পতিভক্তি কে কোথায় দেখিয়াছে! তেমনই প্রেমমাখা ভক্তি বুঝি ভরতের ও লক্ষ্মণের। উত্তরচরিতের "চিত্রদর্শন" নামক প্রথম অঙ্কে সীতার প্রেম ও ভক্তির বিরাট বিকাশ। "ছায়া" নামক তৃতীয় অঙ্কে রামচন্দ্র সীতার প্রেমে কতই অধীর হইয়াছিলেন! যে প্রেমে তিনি সোণার সীতা গড়িয়া রাখিয়া চিরদিন মনোদুঃখে কাঁদিতেন, সেই প্রেম ও হৃদয়বেদনা ভবভূতি এই অঙ্কে কত সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন! আর দেখ প্রেম কৌশল্যা ও জনকের—তাহা চতুর্থ অঙ্কে প্রদর্শিত। সীতা ত বনবাসে যান নাই, তিনি প্রেমের বিচিত্র মন্দিরে জীবিতা ছিলেন। তাঁহার বনবাস সেই প্রেমকে চারি দিকে বিকাশ করিয়া দেখাইয়াছিল। দেখাইয়াছিল, সীতা কেমন রামের

প্রেমসর্ব্বস্ব-ধন, জনকের কত আদরের সামগ্রী, কৌশল্যার কত যত্নের গৃহলক্ষ্মী, দেবর লক্ষ্মণের কেমন প্রেম ও ভক্তিময়ী প্রতিমা।

হিন্দুনারী বড় যতনের ধন। তিনি গৃহলক্ষ্মী, তাঁহাকে লইয়াই হিন্দু-পরিবারের মান, সম্ভ্রম, সকলই। তিনি ভক্তিতে পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি সকল গুরুজনেরই অধীন, আবার স্নেহে সন্তানের ও দেবরের অধীন। স্বতন্ত্রতা তাঁহার কোথাও নাই, কখনই নাই। দুর্ব্বলা নারী, কিরূপে স্বতন্ত্রা থাকিবে? প্রস্থতিকে পরাধীন হইতেই হইবে। তাঁহাকে যে সন্তান গর্ভে ধারণ করিতে হয়—সন্তান সন্ততিগণকে লালনপালন করিয়া মানুষ করিতে হয়। সুতরাং পরাধীনতা তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা। তাই হিন্দুনারী শত বন্ধনে বাঁধা; মনু সে বন্ধন দেন নাই। তিনি যেমন ভক্তি, প্রেম ও স্নেহে সকলকে বাঁধিয়াছেন, সকলেই তাঁহাকে আবার সেই প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। পরস্পর আশ্রয়-আশ্রিতে, হিন্দুপরিবার দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রহিয়াছে। এ ত প্রেমাধীনতা নহে, প্রেমের পরিপুষ্টিসাধন, প্রেমের পরিপূর্ণতা। প্রেম ভক্তিতে মিশ্রিত, ভক্তি প্রেমে মিশ্রিত। ভক্তি ও স্নেহসূত্রে হিন্দুসংসার মিলিত। সেই সংসারের ছবি ও আদর্শ আমাদের আর্য্যসাহিত্যে।

হিন্দু পারিবারিক শাসন।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে আমরা দেখিতে পাই না,—নায়ক নায়িকা বার বার চীৎকার করিয়া বলিতেছে, আমি তোমার

বড় ভালবাসি, শপথ করিয়া বলিতেছি ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি; তোমার জন্য প্রাণ যায়, বুক যায়। এ দোকানদারির আবশ্যকতা হিন্দু সমাজে নাই। হিন্দু সমাজে যে যাহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইতেছে;—তাহাই যথেষ্ট। সেই কর্ত্তব্যসাধনেই সকল ভালবাসা, স্নেহ মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য, ভক্তি ও প্রেম প্রকাশ পাইতেছে। বিবাহ দিবার ভার গুরুজনের হস্তে। সুতরাং এখানে প্রেম বা পতিপত্নী শিকার করিবার প্রয়োজন নাই। বিবাহের পর যে যাহার কর্ত্তব্য সাধন করিলেই যথেষ্ট হইল। এখানে রূপপিপাসা ও ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বিবাহ নহে। সেই কারণে বিবাহ কন্যাপুত্রের হস্তে বিন্যস্ত নাই। গুরুজনেরা কন্যা পুত্রের বিবাহ দেন। এখানে স্ত্রীর শাসন পতি; পতির শাসন পত্নী। উভয়ে পরস্পরের মহাশাসনে আবদ্ধ। এই পারিবারিক ও নৈতিক শাসনে আনিবার নিমিত্ত গুরুজনেরা কন্যাপুত্রের বিবাহ দেন। সংসারের শৃঙ্খলে শীঘ্র শীঘ্র বাঁধিবার জন্য অল্প বয়সে পুত্রকন্যার বিবাহ। যখন যৌবনের প্রবৃত্তিস্রোত বহিবে, যখন রিপু সকল প্রবল হইবে, তখন সেই পুত্রকন্যা সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। তাহাদের আবার হয় ত পুত্র কন্যা হইয়াছে—তাহারা তখন ঘোর সংসারী। সেই সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া তাহাদের কি কিছু করিবার যো আছে? চারি দিকে দৃঢ় বন্ধনে বাঁধা। এ বড় শক্ত বন্ধন; ছেদন করে কাহার সাধ্য? কেবল ঈশ্বরের পরম ভক্তই পারেন। নহিলে হিন্দুসংসার হইতে এক পা দূরে যাওয়া বড়ই কঠিন। যৌবনপথে পদার্পণ করিয়া হিন্দুসংসারে যথেচ্ছাচারী হওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য। যে সমাজ এত বন্ধনে বাঁধা, সে সমাজে

প্রেম ও ভালবাসা চীৎকার করিয়া প্রকাশ করিতে হয় না। তাহা আপনাআপনি প্রকাশ হইয়া পড়ে। সংসার-কার্য্যে তাহা প্রকাশিত হয়। সংসারবন্ধনে তাহা আরও বর্দ্ধিত হয়। সংসারের মহাযজ্ঞসাধনে তাহার মাত্রা পরিপূরিত হয়। গোড়ায় পতিপত্নীর ভালবাসা অল্পে অল্পে অঙ্কুরিত হইয়া একত্র সহবাসে, সংসারের কর্ত্তব্যসাধনে, পুত্র কন্যার লালনপালনে সেই পতিপত্নী যতই একনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করিতে থাকে, যতই তাহাদের সম্মিলন ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া আইসে, ততই তাহাদের স্নেহ মমতা বাড়িতে থাকে; তাহাদের প্রেমের মাত্রা রোগে, শোকে, সেবায়, যত্নে, ক্রমশই পরিপূর্ণ হইতে থাকে। এ ত দুই এক বৎসরের সম্বন্ধ নয়, চিরজীবনের সম্বন্ধ। প্রথমে গুরুজনেরা তাহাদিগকে একত্র রাখিয়াছিল, একত্র তাহাদিগকে লালনপালন করিয়া যৌবনসীমায় পৌঁছিয়া দিয়াছিল। ক্রমে সেই গুরুজনেরা হয় ত একে একে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যাইলে কি হইবে, তাঁহারা নাতিপুতি রাখিয়া গিয়াছেন। তোমার আর সংসারের বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি নাই। এ ত ইউরোপীয় সমাজ নহে যে, পুত্রকন্যাগণ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহাদের বিবাহ নাই, সংসার ধর্ম্ম নাই, তাহারা যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদের ইন্দ্রিয়লালসা প্রবল, অথচ সেই লালসার পারিবারিক শাসনের কোন ব্যবস্থা নাই। জনসাধারণের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যজ্ঞান কিছু তত প্রবল নহে যে, তাহারা আত্মশাসনে থাকিবে। সুতরাং যৌবনের মহা তরঙ্গ তুফানে তাহারা ভাসিয়া যায়। সেই তরঙ্গে যে কে কোথায় গিয়া পড়িবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। যৌবনের প্রকৃতিকে বাঁধিয়া রাখা বড়ই কঠিন।

যেখানে হিন্দুসংসারের সুদৃঢ় শাসনাভাব, সেখানে ত যৌবন যথেচ্ছাচারী হইবারই কথা। সেই দুর্দ্দান্ত যৌবনের যথেচ্ছাচারিতারই ছবি আমরা বিলাতী সাহিত্যে দেখিতে পাই।

হিন্দুপরিবারে প্রেমের স্ফূর্ত্তি।

আর্য্যসাহিত্যের প্রেমাদর্শে, পতিপত্নীর প্রেম অতি নীরবে অথচ বিপুল তরঙ্গে স্ফীত হইয়া বহিয়া যাইতেছে। সে প্রেম প্রথমে পূর্ব্বানুরাগে অতি প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিতে থাকে। অল্পবয়স্ক পতিপত্নীর প্রেমে এই পূর্ব্বানুরাগের প্রবল স্রোত। সে স্রোতের জোর চারি দিকের শাসনে বরং অন্তরে অন্তরে বাড়িতে থাকে। গোপনে গোপনে সে স্রোতের জোর যেন বাহির হইতে চায়। সে তরঙ্গের ঈষৎ আভাস দেখিলে গুরুজনের কতই না আনন্দ হয়। নবানুরাগ পাছে প্রকাশ হয় বলিয়া বধূ কত গোপনে তাহা অন্তরে পোষণ করিয়া রাখেন! তত গোপনে রাখিবার জন্যই তাহার বেগ দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে। তাহা মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আভায় দেখা দেয়। এই পূর্ব্বরাগ প্রকাশিত হইবার নহে বলিয়া তাহার চিত্র আমাদের আর্য্যসাহিত্যে অতি নীরবে, ঈষৎ মাত্রায়, কেবল সঙ্কেতে প্রকাশ হইতে দেখা যায়। বধূর প্রেম গৃহিণীতে বর্দ্ধিত হইয়া দেখা দেয়। গৃহিণীরই প্রেমের সংসার। তাঁহার প্রেম চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত—স্বামীতে, দেবরে, ভাসুরে, শ্বশুরে শাশুড়ীতে এবং নিজ পুত্র কন্যায় প্রবাহিত। আর্য্যসাহিত্যে এই ছবির বিরাট বিকাশ। কৌশল্যা, গান্ধারী, সুমিত্রা, কুন্তী, সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি সকলই এই প্রেমের চিত্র। মায়া মমতায় বৃদ্ধা

হিন্দুনারী নিতান্ত জড়িত। বৃদ্ধার হৃদয় স্নেহের সাগর। সেই স্নেহে তিনি জগৎ শুদ্ধ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। গৌতমীর সেই স্নেহ, কৌশল্যার সেই স্নেহ। সেই স্নেহভরা হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আর্য্যসাহিত্যের এত সৌন্দর্য্য।

আর্য্যসাহিত্যে আদিরস।

এই প্রেমবর্ণনচ্ছলে কালিদাস প্রভৃতি আর্য্যসাহিত্যের আধুনিক কবিগণ শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিয়া, দাম্পত্যপ্রেমের নানা ভাবভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। সেই সকল স্থলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অনেকে বলিবেন, আর্য্যসাহিত্যও কি বিলাসিতা-দোষে দূষিত নহে? আমরা বলি, এই দোষ চাঁদের কলঙ্ক। যাহা বাস্তবিক চন্দ্র, তাহা কলঙ্করেখায় অধিকতর শোভমান হয়; কিন্তু যাহা চন্দ্র নয়, তাহার আবার কলঙ্ক কি? তাহার আগা-গোড়া সমস্তই কলঙ্ক। আর্য্যসাহিত্যের স্থানে স্থানে এরূপ কলঙ্ক থাকিলেও তদ্দ্বারা সুধাভাণ্ডার চন্দ্রমাসম সমগ্র কাব্যরসের ব্যাঘাত হয় না। সমগ্র কাব্য বিলাসিতার দূষিত রসে কলঙ্কিত নহে। আমাদের কবিগণ রসের খেলা ও কাব্যের স্থায়ী রসের বিষয় বিলক্ষণ বুঝিতেন। যে রসে হৃদয়কে আর্দ্র করিতে হইবে, যে রস কাব্যপাঠান্তে হৃদয়ে স্থায়িভাবে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহারা সেই প্রধান রসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমুদায় কাব্যদেহ গড়িতেন। তাই, কোন কাব্যে বীররসের, কোন কাব্যে কারুণ্যের, এবং কোন কাব্যে অন্য কোন রসের প্রাধান্য। তন্মধ্যে অপরাপর রসের অসদ্ভাব নাই বটে, কিন্তু সেই রসাভাস প্রধান রসের

ব্যাঘাত ঘটায় না। যে যে রস যাহার বিরোধী নহে, তাহাদের সমাবেশে কাব্য নানা রসে অলঙ্কৃত হয়। কাব্য নানা রসের আধার হইলেও প্রধান রসেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ গঠিত। সেই প্রধান রস হৃদয়কে বরাবর অধিকার করিয়া কাব্যপাঠান্তে স্থায়ী রূপে বিদ্যমান থাকে। তাই, আলঙ্কারিক বলিয়াছেন, 'রসাত্মক বাক্যই কাব্য'। *

স্ত্রৈণতার শাসন।

আর্য্যসমাজে পতিপত্নীর প্রেম কেমন সংসারের সুব্যবস্থাক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এ জন্য হিন্দুসংসারে পত্নী, পতির প্রতি যত আসক্ত ও একনিষ্ঠ, পতিও পত্নীর প্রতি ততোধিক। অনেক স্থলেই হিন্দুসংসারে পতিপত্নীর প্রেম অবশ্যম্ভাবী। পত্নীর প্রতি পতির প্রেমাভাব অতি বিরল। সীতা রামকে যত ভালবাসিতেন, রামও সীতাকে ততই ভালবাসিতেন। পতিতে একান্ত আসক্তা হইয়া থাকা পত্নীর পক্ষে চলিতে পারে, কিন্তু পত্নীর প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলা করা পতির পক্ষে নিতান্ত অবিধেয়। এ জন্য, ভার্য্যাসক্তি স্ত্রৈণতায় পরিণত হওয়া আর্য্য-সমাজে বড় দোষের কথা। লজ্জা যেমন হিন্দুনারীর অনুরাগকে শাসন করে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি তেমনি স্ত্রৈণতার বিরোধিনী। পতি শুধু ত পত্নীর পতি নহেন, তিনি যে সমগ্র পরিবারের পতি, সমাজের

* এ স্থলে বাক্যশব্দের অর্থ,—যাহা কিছু বলা যাইতে পারে। সমগ্র বেদ যেমন আপ্তবাক্য, সেই রূপ অর্থে বাক্যশব্দ এখানে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এবং তিনি যদি ভূপতি হন, তবে সমগ্র প্রজামণ্ডলীর তিনি প্রতিপালক। পত্নীর কর্ত্তব্য কেবল পরিবারমধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু পতির কর্ত্তব্য সর্ব্বসংসারে। এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগরূক রাখিয়া ভার্য্যাসক্তিকে শাসন করিতে হইবে। এইরূপ শাসনে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া "মেঘদূতের যক্ষ" অভিশপ্ত হইয়া দেশান্তরিত হইয়াছিলেন। সেই দেশান্তরিত যক্ষের প্রেম কত প্রগাঢ়, তাহা কালিদাস অতুল্য তুলিকারাগে চিত্রিত করিয়াছেন। অন্য দিকে দেখ, রামচন্দ্র প্রজানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া তেমন প্রেমময়ী প্রতিমা সীতাকেও বনবাস দিয়াছিলেন; তা বলিয়া সীতাকে কি রাম অত্যন্ত ভালবাসিতেন না? আর্য্যসাহিত্যে প্রগাঢ় পতি-অনুরাগের নাম পতিভক্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু সাতিশয় ভার্য্যাসক্তির নাম স্ত্রৈণতা, কিন্তু পত্নীভক্তি নহে। আর্য্যসমাজের সুনিয়মরক্ষার্থ যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা প্রতিপালন করাই কর্ত্তব্য; তাহাতেই মনুষ্যত্ব।

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা।

আর্য্যসমাজের নৈতিকবন্ধনমধ্যে যেরূপে নরনারী অবস্থিত, তাহা আমরা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিলাম। এ সমাজের গঠনই এই প্রকার যে, তাহাতে মানবপ্রকৃতির পশুভাবের স্ফূর্ত্তি হইবার যো নাই। দেশাচারের অনুশাসনে দেবত্বেরই বিকাশ হইবার কথা। দেশাচার সমস্ত মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের প্রতিপোষক হওয়াতে, সেই দেশাচারের অধীনতা এবং দেবত্বের অধীনতা একই কথা হইয়া পড়িয়াছে। সামাজিক নিয়মে আবদ্ধ করিয়া নরনারীকে

দেবত্বোন্মুখ করিয়া রাখা সামাজিক নীতি ও কৌশল। দেবত্বের অধীনতাই মানবের আত্ম-অধীনতা। এই প্রকার আত্ম-অধীনতা বা পরমার্থের পরতন্ত্রতাই মনুষ্যের প্রকৃত স্বাধীনতা। আত্মা যখন পরমাত্মার পরমার্থের অধীন, তখনই তাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন। যিনি এই অধীনতা বা প্রকৃত স্বাধীনতা ছাড়িয়া বহিরিন্দ্রিয়ের অধীনতা স্বীকার করেন, তিনি ত স্বাধীন নহেন; তিনি স্বকীয় ইচ্ছার অধীন। ইচ্ছা বহির্জগতের প্রভাবে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইতেছে। সেই ইচ্ছা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের অধীন হইয়া বহির্জগতের অধীন। সেই ইচ্ছার দাস হওয়াই স্বেচ্ছা-চারিতা। যিনি স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণ করিয়া প্রকৃত স্বাধীন পথে আইসেন, তিনিই মনুষ্যত্বলাভের যোগ্যপাত্র। আমাদের দেশাচারের প্রকৃত উদ্দেশ্যানুগামী হইলে, সেইরূপ মনুষ্যত্বলাভের যোগ্যপাত্র হওয়া যায়। যে প্রেমপ্রবৃত্তি এই মনুষ্যত্ব-সাধক, সেই প্রবৃত্তির বিকাশ আর্য্যসমাজে। যাহা আর্য্যসমাজে, আর্য্যসাহিত্যে তাহার স্থান।

আর্য্যসাহিত্যে প্রেমগৌরব।

আর্য্যসাহিত্যে প্রেম, ভক্তিতে পরিদৃশ্যমান। এই ভক্তিতে প্রেম একদা বর্দ্ধিত ও অনুশাসিত। সেই শাসন ও পরিবর্দ্ধনে প্রেমের উচ্চতা ও গৌরব। আর্য্যসাহিত্যের এই গৌরব পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিছুই পরিদৃষ্ট হয় না। আর্য্যসাহিত্যের পতিভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, বাৎসল্য, ভার্য্যানুরাগ, শিষ্যানু-রাগ প্রভৃতি অনুরাগে যেরূপ প্রেমের বিকাশ ও শাসন, প্রেমের

সেরূপ বিকাশ ও শাসন পাশ্চাত্য-সাহিত্যে কই? পাশ্চাত্য-সাহিত্যে কি সীতা আছে, লক্ষ্মণ আছে, রাম আছে, না যুধিষ্ঠির আছে? থাকিবার যো নাই।

বাল্যবিবাহের শুভ ফল।

আর্য্যসাহিত্যে যে প্রেমাদর্শ, তাহা প্রেমের সৌন্দর্য্য। সীতা যদি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আর্য্য-সাহিত্যেই প্রেমের সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রেমের মূর্ত্তিতে আর্য্যসাহিত্য চিত্রিত। আমাদের নারীগণের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেম সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য আর্য্যসমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। সুকুমারমতি বালিকাগণের নবানুরাগ অল্প বয়স হইতে পতি ও গুরুজনে সঞ্চারিত হয়। হৃদয়ে যখন অনুরাগ মুকুলিত হইতেছে, তখন হইতে কোমলহৃদয়া কন্যাগণ উপযুক্ত পতির অঙ্কে অর্পিত হয়। তাহাদের অনুরাগ নিজ বিষয় পাইয়া স্বতঃ উপযুক্ত পাত্রে ধাবিত ও ন্যস্ত হয়। যৌবনসঞ্চারে সেই অনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পতিতেই আবদ্ধ হয়। তরুণকাল হইতে কন্যাগণ শ্বশুরকুলে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া, সেই কুলেই স্নেহ মমতায় জড়িত থাকে। পতির এবং গুরুজনের সেবা-শুশ্রূষায় তাহাদের আনুগত্য অতি সহজ বোধ হয়। তজ্জন্য আর্য্যনারীগণের সংসার শান্তিময় প্রেমনিকেতনে পরিণত হয়। আর্য্যনারী অনেক গুণের আধার। পাতিব্রত্য, প্রেম, স্নেহ, মমতা, ভক্তি, সরলতা, সত্যাচরণ, দয়া, ক্ষমা, ধীরতা, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, বশ্যতা, লজ্জা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি নানা মহার্ঘ গুণে আর্য্য-

সতী ভূষিতা হয়েন। নানাবিধ গুণভূষিতা আর্য্যনারী আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বাল্যবিবাহের ফল। এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিলে সে ফলও দুষ্প্রাপ্য হইবে। সুতরাং এই ব্যবস্থা এবং বন্দোবস্ত যাহাতে অব্যাহত থাকে, আমাদের তাহাই করা কর্ত্তব্য।

আজি কালি অনেক ইংরাজীওয়ালা না বুঝিয়া আমাদের বাল্যবিবাহ ও সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাঁহারা বাল্যবিবাহকে সমাজের অনিষ্টের কারণ জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্যসমাজে প্রচলিত আছে। মনুর ব্যবস্থানুরূপ আর্য্যসমাজ অতি প্রাচীনকালেও অবস্থিত ছিল। মনুর ব্যবস্থায় স্ত্রীজাতির বাল্যবিবাহই প্রসিদ্ধ এবং প্রশস্ত। গৌরীদানের ফল আর্য্যসাহিত্যে ঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু এক দিকে যেমন গৌরীদান, অন্য দিকে তেমনি আর্য্যভূমি বীরমাতৃরূপে চিত্রিত। এই আর্য্যভূমি যখন বীরগণের লীলাক্ষেত্র ছিল; কি ক্ষত্রিয়-বীরত্ব, কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্মনৈতিক বীরত্ব,—এই উভয়বিধ বীরত্বে যখন ভারত গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল; যখন ব্রাহ্মণ নিবৃত্তি-ধর্ম্মের বীরত্ব দেখাইতেন; যখন ক্ষত্রিয় তেজ ও ক্ষত্রিয়রাজ ভারতরাজ্যের শাসন ও রক্ষা করিত; যখন ধন, মান ও জ্ঞানের গৌরবে ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল; তখনও বাল্যবিবাহ ছিল, এবং সেই বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ ভারতীয় আর্য্যবীরগণের সমুদ্ভব হইত। এসিয়ার মহা ভূখণ্ডের অনেক দেশ এবং জাতির মধ্যেও ত বাল্যবিবাহ প্রচলিত। মুসলমান জাতি মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে বাল্যবিবাহ বিদ্যমান দেখা যায়। যমদূতস্বরূপ পাঠান-

গণ আজিও বাল্যবিবাহের অনুকূল সাক্ষ্যই দিতেছে। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের বলিষ্ঠ হিন্দু সন্তানগণ, বীর রাজপুত ও হিন্দু পাঞ্জাবী-গণ ত বাল্যবিবাহজাত। তবে দেশের গুণে যে স্থানে জীবজন্তু স্বভাবতঃই দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় হয়, সে স্থানের কথা স্বতন্ত্র। খর্ব্ব-কায় হইলেই যে মনস্বিতায় খর্ব্ব হইতে হইবে, এমত কিছু নিয়ম নহে। খর্ব্ব মহারাষ্ট্র বা গুরখা যে উন্নতকায় পঞ্জাবী অপেক্ষা তেজস্বিতায় ন্যূন, এ কথা প্রমাণসাপেক্ষ। ইংরাজ সৈন্যদলভুক্ত খর্ব্বকায় ওয়েলশ্ সেনা যে দীর্ঘদেহ হাইল্যাণ্ডার অপেক্ষা তেজ-স্বিতায় ন্যূন,' এ কথা সপ্রমাণ হয় না। বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সরসক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জের যেমন সমৃদ্ধি, জীব জন্তু ও মনুষ্যের তদ্রূপ নহে। বাঙ্গালার ফিরিঙ্গিগণের মধ্যে ত বাল্য-বিবাহ প্রচলিত নাই, তথাপি সেই ফিরিঙ্গীগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও খর্ব্বাকৃতি কেন? যাহা অন্য কারণের ফল, অনেকে না বুঝিয়া তাহা বাল্যবিবাহে আরোপ করিয়া বসে।

বিলাতী প্রেমের সাম্যভাব।

ভক্তি বলিয়া যে জিনিষ হিন্দুসংসার ও সমাজে বর্ত্তমান, যাহা সেই সংসার ও সমাজের সুদৃঢ়বন্ধনী, সে জিনিষ বিলাতী সংসার ও সমাজে বড়ই দুর্ল্লভ। কারণ, সেখানে পতিপত্নীর সম্বন্ধে উচ্চনীচতা ও অধীনতা নাই, উভয়ই সমান। সেখানে প্রেমের বিনিময় আছে—তুমি ভালবাস, আমি ভালবাসিব; নহিলে তুমিই বা কে, আমিই বা কে? তোমাতে আমাতে কোন সম্বন্ধ নাই; আজই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হউক। সে সমাজে পতিপত্নী-

ত্যাগ, রমণীগণের বহুবার বিবাহ, এবং যৌবনে ইচ্ছাবরী হইবার প্রথা প্রচলিত থাকাতে, পতিপত্নীর মধ্যে সাম্যভাব ও স্বেচ্ছাচারিতা এত প্রবল। তাই সাম্যভাব ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় পাশ্চাত্য সাহিত্যে। সেই সাহিত্যের নিয়ত আলোচনায় সুতরাং পাঠকের মনে সেই সাম্যভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে। এই সাম্যভাবেরই ছবি আমাদের আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পাঠক আমাদের তরুণবয়স্ক যুবক এবং যুবতীগণ। ইংরাজগণের ও বিবিদিগের সংসর্গগুণেও এই সাম্যভাব আমাদের সমাজে ও অন্তঃপুরমধ্যে অজ্ঞাতসারে প্রবিষ্ট হইতেছে। সেকালের বৃদ্ধ কর্ত্তৃপক্ষগণ এখন আর জীবিত নাই। যাহারা এক্ষণে সংসারের পতি, তাহারা অনেকেই ইংরাজী সাম্যভাবে পরিপূর্ণ। সুতরাং তাহারা নিজেই আমাদের রমণীগণের মনে সাম্যভাব আরও সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। কিন্তু এ সমাজে বিলাতী সাম্যভাব ও প্রেমের স্থান কোথায়? বিলাতী প্রেমের সাম্যভাব এখানে আনিলে প্রলয় ঘটিবে। যে সমাজে বিবাহবন্ধনের ছেদন নাই; পতিপত্নীর সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য, যে সমাজ ভক্তি ও স্নেহবন্ধনে গাঁথা; সতী ও পতিব্রতা নারীর লীলাক্ষেত্র; সরলতা, প্রেম, মৃদুতা, লজ্জা, বশ্যতা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যথায় সংসারিণীর গুণ, সেথানে সাম্যভাবের প্রাবল্য হইলে মহাশান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। সেথানে চাই উচ্চনীচতা, আত্মশাসন-অধীনতা, এবং যে আত্মশাসনের নামান্তর স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতা হিন্দুসমাজে, তাহা পাশ্চাত্য সমাজে নাই। যে স্বাধীনতা পাশ্চাত্য সমাজে, হিন্দুসমাজে তাহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা।

বঙ্গসাহিত্যে বিলাতী হিন্দুনারী।

আর্য্যসাহিত্যে যে প্রকৃত প্রেমের বিকাশ, সেই প্রেমাদর্শ হইতে পতিত হইয়া আমাদের বঙ্কিম অভক্তির সহিত বলিয়াছিলেন, আর্য্যসাহিত্যে সকল নারীই হয় সীতার ছাঁচে, না হয় দ্রৌপদীর ছাঁচে গঠিত। সীতা ও দ্রৌপদী যে প্রেমাদর্শের সৃষ্টি, তিনি সেই প্রেমাদর্শ হারাইয়াছিলেন। তাঁহার মনে তখন ফষ্টর ও শৈবলিনীর বিলাতী পাপপ্রেম জাগিতেছিল। তাই তিনি বিলাতী প্রেমে হিন্দুনারীকে গড়িতে গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কতিপয় ঔপন্যাসিক সুন্দরী এক একটি বিলাতী হিন্দুনারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী কাব্য নাটকে নারীচরিত্রের যে সৌন্দর্য্য, তাঁহার সেই সুন্দরীগণের সেই সৌন্দর্য্য। কিন্তু যে লজ্জাশীলতা, সহিষ্ণুতা, মৃদুতা, সরলতা, পাতিব্রত্য, সতীত্ব, ভক্তি ও পবিত্রতায় হিন্দুনারী অসাধারণ গুণভূষিতা হইয়া জগতের মনোহরণ করেন, হিন্দুনারীর সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তাহাতে নাই। স্বাতন্ত্র্য ও সাম্যভাবে তিনি হিন্দুনারীকে গড়িয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর ঔপন্যাসিক নারীগণের মানবপ্রকৃতিগত সৌন্দর্য্য আমি "কাব্যসুন্দরী"তে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু মানবপ্রকৃতি হিন্দুনারীতে যেরূপে দেবত্বে উঠিয়া পবিত্র হইয়াছে, সেই পুণ্য প্রকৃতি দুই এক জন ভিন্ন আমি সেই নারীগণে অল্পই দেখিতে পাই। এজন্য তাহাদের সৌন্দর্য্য বিবৃত করিবার সময়ে হিন্দুর চক্ষে সেই সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখায়, এ কথার বিচার মূলেই উত্থাপিত করি নাই। যে হিন্দুকল্পনায় সীতা ও দ্রৌপদী জাজ্বল্যমান, সে কল্পনার সহিত কি বঙ্কিম বাবুর সুন্দরীগণ মিশিতে

পারেন? সুতরাং বিশুদ্ধ হিন্দুকল্পনায় সে সুন্দরীগণ মিশ খায় নাই; তাহারা বিলক্ষণ স্বতন্ত্র হইয়া সেই কল্পনা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। কখন মিশিবে কি না, কে বলিতে পারে?

আর্য্যসাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা।

আমরা কি বিলাতী সমাজের প্রয়াসী? আমরা কি প্রেম ও ভক্তিপ্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজ উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে বিলাতী সমাজ আনিতে চাই? এই দুই সমাজের গঠন সম্পূর্ণ বিপরীত। উভয়ের প্রেমাদর্শে এ কথার অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করা গিয়াছে। আমাদের সাহিত্যের প্রেমাদর্শে, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও স্ফূর্ত্তি এবং ধর্ম্ম-নৈতিক শাসন প্রবল; বিলাতী আদর্শে প্রাকৃতিক রিপুর প্রাধান্য। রিপুগণ চপল ইন্দ্রিয়সুখেরই অনুকূল, এবং শান্তিসাধক প্রেম, ভক্তি, দয়া, ধর্ম্মাদির প্রতিকূল। এ আদর্শে ধর্ম্মনৈতিক শাসনের অধীনতা; সে আদর্শে স্বার্থপর সাম্যভাব। এ আদর্শে স্বাধীনতা, সে আদর্শে স্বেচ্ছাচারিতা। এক স্থানে সুতরাং এই দ্বিবিধ আদর্শের সমাবেশ হইতে পারে না। তাহাদের সামঞ্জস্য সম্ভাবিত নহে। দেশীয় আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া যতই আমরা বিদেশীয় সমাজনীতির অনুসরণ করিব, আমাদের সমাজ ততই সেইরূপে সংগঠিত হইতে থাকিবে। অবশেষে হিন্দুসমাজের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ বিলাতী সমাজ আসিয়া পড়িবে। কিন্তু বিলাতী সমাজ নানা দোষের আধার। আবার আমরা সেই সমস্ত দোষে আমাদের বেদপূত ও সংস্কৃত সমাজকে নিমজ্জিত করিতে চাই

না; দেবত্ব এবং মনুষ্যত্ব হইতে পশুত্বে নামিতে চাহি না। কি উপায়ে আমরা এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হই? বিলাতী সাহিত্যের আলোচনা ত আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অর্থকরী বিদ্যা না শিখিলে নয়। নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জনের জন্যও তাহার আলোচনা আবশ্যক। কিন্তু সেই বিদ্যালোচনায় যেরূপ উদ্ধত বিলাতী ভাবের ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হইতেছে, তাহার দমন করা আবশ্যক। স্বদেশীয় সাহিত্যালোচনায় তাহার দমন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই নিমিত্ত এখন ইংরাজী বিদ্যার সহিত সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক আলোচনা আবশ্যক। আমাদিগের গৃহধাম ও পরিবার মধ্যে যেন বিলাতী সাহিত্যের বিষভাগ প্রবেশলাভ না করে, তদ্বিষয়ে আমাদের একান্ত সাবধান হওয়া উচিত। যে স্বদেশীয় সাহিত্য আলোচনা করিয়া আমাদের পুরস্ত্রীগণ এককালে নানা গুণে ভূষিতা হইয়া বিনীত সাধুভাবে ও হিন্দুসংস্কারে প্রবুদ্ধা হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সাহিত্যালোচনায় তাঁহাদিগকে নিরত করিয়া রাখিলে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্য দিকে, তাঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া আমরাও সেই সাহিত্যের সাধুভাব, পবিত্রতা, সংযমশিক্ষা, বিনয়, নৈতিক সৌন্দর্য্য ও মহান্ উপদেশসমুদায় নিজে পর্য্যালোচনা ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া, উদ্ধত বিলাতী ভাবস্ফূর্ত্তির দমন করিব, এবং হিন্দুসংস্কার সমুদায় প্রাদুর্ভূত রাখিয়া হিন্দু সমাজের বিধ্বংস নিবারণ করিব।

সাহিত্যে বীরত্ব।

বীরের আদর্শ।

আর্য্যকবিগুরু বাল্মীকি এক দিকে সীতার সৃষ্টি করিয়া যেমন সতীর আদর্শ দিয়াছেন, অন্য দিকে, রামচন্দ্রের সৃষ্টি করিয়া তেমনি আর্য্যবীরের আদর্শ দিয়াছেন। সীতায় আমরা আর্য্য-ললনার সৌন্দর্য্য, প্রেম, ভক্তি ও দেবত্ব দেখি; রামচন্দ্রে, আর্য্য-সন্তানের গৌরব, পুরুষত্ব, বীরত্ব ও রাজশ্রীর দিব্যজ্যোতিঃ দেখি। যে কুল ও জাতিতে আর্য্যসন্তান সমুদ্ভূত হন, সেই কুলতিলক হইতে পারিলে এবং সেই জাতিতে গৌরবপাত করিতে পারিলেই তাহার গৌরব। রামচন্দ্রে সেই গৌরব দৃষ্ট হয়; তিনি রঘুকুল-তিলক ও ক্ষত্রিয়রাজপ্রধান। তাঁহার এই গৌরব দেখাইবার জন্য বাল্মীকি অগ্রে রাজা দশরথের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। দশরথের বীরত্ব ও রাজ্যশাসন, প্রভুত্ব ও যশ, মন্ত্রণা ও কৌশল, সম্পদ ও সুহৃৎ, রাষ্ট্র ও দুর্গ, ধন ও সেনাবল, ধর্ম্মপরায়ণতা ও তপস্যা, বিদ্যা ও বুদ্ধি, সকলই পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া আমা-দের মানসচক্ষে দেদীপ্যমান করিয়া দিলেন। অযোধ্যারাজ্যের সুখ, সম্পদ ও সৌন্দর্য্য আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই মোহিত হইলাম। আমরা দেখিলাম, তেমন রাজা বুঝি আর হইবে না। কল্পনায় রাজসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইল। কিন্তু তাহার পরেই দেখিতে পাই, তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর তারা সেই রাজকুলে সমুদিত হইতেছে। সেই নক্ষত্রের কথা আর কেহই নহে, একজন ঋষি আসিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিদিত করিলেন। ঋষি, জ্ঞান-বলে জানিয়া-

ছিলেন, রঘুরাজকুলে যে অসামান্য বীর জন্মিয়াছেন, তিনিই সর্ব্ববীরশ্রেষ্ঠ, তাঁহার তরুণ বয়সের বীরত্বেই আশ্রম-পীড়া ও তপোবিঘ্ন নিবারিত হইবে। দশরথের রাজসভায় দেবদূতরূপে উদিত হইয়া বিশ্বামিত্র যখন রামচন্দ্রের গৌরব বাড়াইয়া তাঁহাকে বীরকার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, তখন রামের গৌরবে আমাদের হৃদয় সহসা আলোকিত হইল। আমরা এক দিব্য-নক্ষত্রের উজ্জ্বল বিভা সহসা দেখিতে পাইলাম। এই অনুকরণে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম নারদ-মুখে পরে ব্যক্ত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্র বীরকার্য্যে কুমার রামচন্দ্রকে লইয়া গেলেন। রামচন্দ্রও অসীমসাহসে সেই দুরূহ কার্য্যে বীরের ন্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কিরূপ ফললাভ করিয়াছিলেন, বাল্মীকি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেইখানেই এই কৌমার বীরত্বের শেষ পরিচয় নহে। বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সেই বীরত্ববিকাশের স্থল হইতে আর এক উজ্জ্বলতর বীরত্ববিকাশের ক্ষেত্রে লইয়া গেলেন। জনকালয়ে অনেক রাজচক্রবর্ত্তী বীরাগ্রগণ্য ধনুর্ভঙ্গে পরাস্ত হইয়া গিয়াছেন; সেই ধনুর্ভঙ্গ পণে রামচন্দ্র উপস্থিত। রাম অবলীলাক্রমে ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া কেমন অতুল্য বিক্রম ও বলের পরিচয় দিয়া ভারতে বীরত্ব যশের সৌরভ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা রামায়ণ-পাঠক-মাত্রেরই বিদিত আছে। কিন্তু এই অসামান্য বীরত্বও বুঝি সামান্য কথা। তাঁহার ভুবন-দুর্ল্লভ বীরত্ব পরিচয়ের তদপেক্ষাও উজ্জ্বলতর ক্ষেত্র আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইল। রাজকন্যালাভ করিয়া রাজীবলোচন অযোধ্যাভিমুখে আসিতেছেন, পথে ভৃগুরাম দেখা দিলেন। ভৃগু-রাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। তেমন অতুল্য বীর কার্ত্ত-

বীর্য্য অর্জ্জুন তাঁহার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। কোন ক্ষত্রিয় বীরের তেজঃ পরশুরাম অব্যাহত রাখেন নাই। সেই পরশুরাম আসিয়া রামের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন। তিনি হরধনু অপেক্ষাও এক ভয়ঙ্করাকার ধনু রামচন্দ্রকে আকর্ষণ করিতে দিলেন। কিন্তু যে রামচন্দ্র শৈবধনু ভগ্ন করিয়াছেন, তিনি যে বৈষ্ণব ধনু ভগ্ন করিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি! তিনি অনায়াসে সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া পরশুরামের সমক্ষে নিজ অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিলেন। পরশুরাম সেই পরিচয়ে বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। মনে মনে স্বীকার করিলেন, রঘুবীর আমার অপেক্ষাও বুঝি বীরত্বে শ্রেষ্ঠ। পরশুরাম আর যুদ্ধ করিতে চাহিলেন না; তাঁহার দর্প চূর্ণ হইল। রামের অদ্ভুত বীরত্ব-বিকাশ দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দশরথ অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন।

বাল্মীকি, রামচন্দ্রের এইরূপ বাল্যবীরত্ব দেখাইয়া তাঁহার জীবনী আরম্ভ করিলেন। এই বাল্যবীরত্ব বুঝি হীনপ্রভ করিবার জন্য ব্যাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিদাস রামের গৌরব সম্যক্ বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত রঘুকুলের আরও পশ্চাদ্দেশে গেলেন। তিনি প্রথমে দিলীপচরিত্র দেখাইলেন। তৎপুত্র রঘু সেই দিলীপচরিত্রকেও নিভপ্র করিয়া দিয়া কেমন কুলগৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন, কালিদাস তাহা রঘুবীরচরিত্রে সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন। রঘুবীর এত দূর যশস্বী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার নামেই কুল স্থাপিত হইল। কিন্তু কালিদাস আবার দেখাইলেন, রঘুকুলে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেই কুলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবে পূর্ণ করিলেন। তাই রামচন্দ্র রঘুকুলতিলক

নামে সকলের যশ হরণ করিলেন। রঘুকুল রামযশে গৌরবিত হইল।

পৃথিবীর অন্যদেশীয় কোন রাজবংশ ধারাবাহিক ক্রমে যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, এরূপ বৃত্তান্ত আমরা কোন জাতির ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই না। দিলীপের পর রঘু, রঘুর পর অজ, অজরাজের পর দশরথ, দশরথের পর রামচন্দ্রে রাজকুল চরমোৎকর্ষে আসিয়া উপনীত হইল। কুশ, অতিথি, সুদর্শনাদি পর-পুরুষেরা রামচন্দ্রেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই; তিনি সকলকেই অতিক্রম করিয়াছিলেন। কালিদাসের হস্তে রামচন্দ্রের এই গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর্য্যসাহিত্যে এইরূপ নৃপতিগণের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্যার ওয়াল্টার স্কট, স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের সীমান্তদেশীয় রণবীরগণের রক্তরঞ্জিত বীরত্বগানে যেমন রোমাঞ্চপূর্ণ হইতেন, আর্য্যকবি এইরূপ রাজবীরগণের যশোকীর্ত্তনে তেমনি আনন্দ লাভ করিতেন।

রামের অপরিসীম ভুজবল ও ক্ষত্রিয়তেজ প্রদর্শন করিয়া বাল্মীকি রামচন্দ্রের অন্যবিধ বীরত্বের বিকাশ দেখাইতে গেলেন। ভুজবল-বিকাশে এবং রাক্ষস ও দৈত্যবিজয়ে যে ক্ষত্রিয় বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা বাহুবীরত্ব। এ বীরত্বে পৃথিবীর অনেক দিগ্বিজয়ী বীর যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু যে বীরত্বে, ভারত ব্যতীত, সমস্ত পৃথিবীর বীর রামচন্দ্রের নিকট পরাস্ত, রামের সেই আভ্যন্তরিক বীরত্ব বাল্মীকি এখনও দেখান নাই। আমরা এই দ্বিবিধ বীরত্বের বিষয় ক্রমে ক্রমে পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

আসুরিক বীরত্ব।

আর্য্যসাহিত্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। মানব যেখানে পশুর সঙ্গে সমান, সেখানে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব নহে, মানব যেখানে পশু হইতে বিভিন্ন, সেইখানেই তাহার মনুষ্যত্ব। পশুগণ যেমন ইন্দ্রিয় এবং কামাক্রোধাদি রিপুগণের বশীভূত, মনুষ্য তদ্রূপ তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া প্রমত্ত হইলে তাহার পশুত্ব; কিন্তু সেই ইন্দ্রিয় এবং রিপু সকলের উপর জয়লাভ করাতে মনুষ্যত্ব। মহাভারত বলিয়াছেন :—

"কামক্রোধসমাযুক্তো হিংসালোভসমন্বিতঃ।
মনুষ্যত্বাৎ পরিভ্রষ্ট-স্তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রসূয়তে ॥
তির্য্যগ্‌যোন্যাঃ পৃথগ্‌ভাবো মনুষ্যার্থে বিধীয়তে।" বনপর্ব্ব।

"কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগ্‌যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়।"

রাজর্ষি নহুষ এ কথার মহান্ দৃষ্টান্ত। বেদে যাহা সূক্ষ্মতত্ত্ব, পৌরাণিক কাব্যে তাহা অবয়বী কল্পনা। কারণ, যাহা অবয়বী রূপে প্রতীয়মান এবং মানসচক্ষে প্রত্যক্ষীভূত, হৃদয়ে তাহার সংস্কার অধিকতর দৃঢ় হইয়া যায়। এজন্য, মহাভারত অবয়বী কল্পনায় পরিদৃশ্যমান করিয়া দেখাইলেন যে, রাজর্ষি নহুষ রিপু-পরায়ণতার পাপে স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্বর্গে গিয়া তিনি শচীর প্রতি কামান্ধ এবং অহঙ্কারে মত্ত হইয়া ঋষিগণকে বাহন করিয়া অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই শাস্তি।

মানবের এই রিপুসকল কত প্রবল হইতে পারে, প্রবল হইয়া

তাহাকে কত দূর প্রমত্ত করিয়া তুলে, তাহা ইউরোপীয় ট্র্যাজিডি এবং ঐতিহাসিক বীরগণে বিলক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। "সাহিত্যের আদর্শ" নামক প্রস্তাবে আমরা ট্র্যাজিডির ধর্ম্মবর্ণনস্থলে তাহার প্রধান প্রধান পুরুষ ও স্ত্রীচরিত্রের রিপুপ্রাবল্য কত অধিক, তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। সেই রিপুর বশবর্ত্তী হইলে মনুষ্যের যে প্রমত্ততা জন্মে, সেই প্রমত্ততা ও মোহ প্রভাবে নররূপী অসুরসমূহ যে কত অকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ট্র্যাজিডিতে তাহা দেদীপ্যমান হইয়াছে। ট্র্যাজিডির গৌরব বাড়াইয়া ইউরোপ তদুক্ত পাত্র ও পাত্রীগণেরও গৌরব বাড়াইয়াছে; সেই প্রধান পাত্র এবং পাত্রীগণ এক প্রকার বীররূপে লোকের মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা কল্পনায় সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তাহারা কল্পনার এক প্রকার মিত্র হইয়া পড়ে; যাহারা মানসচক্ষে নিয়ত জাজ্জ্বল্যমান, তাহাদের প্রতি লোকের তত অপরক্তি থাকে না। তাহারা ক্রমে মনে মনে গৌরবভাজন বীররূপে প্রতিয়মান হয়। লেডি ম্যাকবেথ লোভে বীররমণী; কামদ্বেষে ওথেলো বীর; কৌশলে ইয়্যাগো। ট্র্যাজিডিতে এইরূপ বীরত্বের প্রতিষ্ঠা।

ইউরোপীয় ট্র্যাজিডিতে যে বীরত্বের প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসেও সেই বীরত্বের গৌরব। কামনার ঘোর পিপাসার পরতন্ত্র হইয়া, লোভের সর্ব্বগ্রাসিনী লালসার বশবর্ত্তী হইয়া, দর্পে স্ফীত হইয়া ও গর্ব্বে পৃথিবীকে তৃণজ্ঞান করিয়া এবং সেই ঘোর উন্মত্ততায় মাতিয়া যে সকল রণপ্রিয় ও জয়োল্লাসী নররূপী দানব পৃথিবীকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়া নিজ নিজ প্রভুত্বস্থাপন করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় ইতিহাসে তাঁহারা বীর নামে বিখ্যাত ও পূজিত হইয়াছেন। সেইরূপ বীর এলেকজ্যাণ্ডার, জুলিয়স সিজর, নেপো-

লিয়ন, হ্যানিবল প্রভৃতি। তাঁহারা ট্র্যাজিডির বীরগণের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা। তদপেক্ষাও অধিক। তাঁহারা এক এক সময়ে পৃথিবী তোলপাড় করিয়া বেড়াইয়াছেন। পৃথিবীর চারি দিকেই রক্তনদী প্রবাহিত করিয়া দিয়া মহাবীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আর্য্যসাহিত্যের অসুরগণও এক এক সময়ে পৃথিবীতে উদিত হইয়া এক এক জন কাম, ক্রোধাদির মূর্ত্তিধারণ করিয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন—সেইরূপ প্রতিষ্ঠা, যেরূপ প্রতিষ্ঠায় ইউরোপে ঐতিহাসিক ও ট্র্যাজিডির বীরগণ পূজার্হ হইয়া আছেন। সেই জন্য আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায়, এই অসুরগণ এক এক সময়ে স্বর্গেও প্রভুত্বলাভ করিয়া দেবোপম হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, ইউরোপীয় ইতিহাসে কি তদ্রূপ আসুরিক বীরগণ দেবসম্মান লাভ করেন নাই? কিন্তু ইউরোপীয় ইতিবৃত্ত এবং আর্য্যসাহিত্যে বিস্তর প্রভেদ। ইউরোপীয় ইতিহাসে এবং ট্র্যাজিডিতে সেই বীরগণ চিরদিনই দেবোপম এবং প্রতিষ্ঠাপাত্র হইয়া রহিয়া গিয়াছেন; আর্য্যসাহিত্যে সেই বীরগণের বিক্রম ও দর্প চূর্ণ, তাহাদের গর্ব্ব খর্ব্বীকৃত, তাহাদের লোভ নিবারিত, তাহাদের তেজ সংহৃত, এবং প্রভুত্ব ও প্রতাপ বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। তাঁহারা অসুরনামে কলঙ্কিত হইয়া আছেন। সামান্য জনগণের মনে তাঁহারা যে দেবসম্মান লাভ করেন, সেই দেবসম্মান হইতে দেবেন্দ্র তাঁহাদিগকে বিচ্যুত করিয়াছেন। কৃষ্ণ এবং রামরূপ দেবাবতারগণ তাঁহাদিগকে অধঃপাতে দিয়াছেন। দেবতা নহিলে দেবতাকে বিনষ্ট করিতে পারে না। মানুষের রিপুপ্রাবল্যে যে পশুত্বের আসুরিক দেবতা সৃষ্ট, সেই পশুত্বের দেবতাকে সুরবীরগণ ধ্বংস করিয়াছেন।

ট্র্যাজিডি ও ইউরোপীয় ইতিহাসে পাশব বীরগণ এবং আর্য্য-সাহিত্যের অসুরগণ সকলেই একজাতীয় বীর। তাহাদের পাশব রিপু অত্যন্ত প্রবল। তন্নিমিত্ত সেইরূপ একবীরের ইতিহাস লিখিলেই তজ্জাতীয় সমস্ত বীরের ইতিহাস লেখা হইল। আর্য্য-কবি সেই সমস্ত বীরকে একত্রিত করিয়া তাহাদের আদর্শ বীরের সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্যাসের এই দুর্য্যোধনে ইউরোপীয় অনেক ঐতিহাসিক বীর চিত্রিত। তদ্রূপ রামায়ণের রাবণ। ভোগবাসনা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া মানবকে কেমন মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, মানব কেমন লোভের সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি সাজিয়া অন্তকে এক সূচ্যগ্র-প্রমাণ ভূমি দিতেও কাতর হয়, দুর্য্যোধন তাহারই প্রতিমা। আর ইন্দ্রিয়লালসা ও কাম কেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃই মানবকে ধ্বংস-পথে আনে, সেই দশেন্দ্রিয়ের মূর্ত্তিমান কায় দশমুণ্ডযুক্ত সর্ব্বগ্রাসী রাক্ষস মূর্ত্তি রাবণ। এই পাশববীরগণের আদর্শ চরিত্র আর্য্যসাহিত্যে চিত্রিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত লিখিয়াই স্থির থাকে নাই। কারণ, সেই পর্য্যন্ত লিখিলেই সেই বীরচরিত্র পাঠে কুফল দর্শিবে। তদ্রূপ সমস্ত পার্থিব বীর-গণেরও চরিত্র লেখা আবশ্যক নহে। কারণ, সর্ব্বদা পাপচিত্র দেখিলে কল্পনা দূষিত হইয়া পড়ে। এজন্য আর্য্যকবিগণ সেইরূপ আসুরিক বীরত্বের আদর্শ প্রতিমা সকল গড়িয়া কাব্যমধ্যে তাহাদিগকে একপার্শ্বে রাখিলেন, অন্য পার্শ্বে অন্যবিধ বীরের ভাস্বর চিত্র মনোহর বর্ণে চিত্রিত করিলেন। ধর্ম্মবীরগণের উজ্জ্বলতর চিত্র পাশব বীরগণকে অন্ধকারে ঢাকিয়া ফেলিল। সে আলেখ্যদর্শনের ফল সুতরাং কল্পনাকে ধর্ম্মভাবেই পূর্ণ করিয়া রাখে। তজ্জন্য এই কাব্যবীরগণ এক প্রকার ঐতিহাসিক চিত্র।

এই আসুরিক প্রতিমা সকল ব্যবহারিক ইতিহাসের মূর্ত্তি অনু-চিত্রিত করে। মহাভারতে দুর্য্যোধনের চরিত্র পাঠ কর, তুমি ইউ-রোপীয় সদৃশ বীরগণের ইতিবৃত্ত পড়িয়া ফেলিলে, অথচ তৎসঙ্গে সমগ্র রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া তোমার কল্পনা কোন মতেই দূষিত হইল না।

সার্লমান, এলেকজ্যাণ্ডার, জুলিয়স সিসার, নেপোলিয়ন, ফ্রেডেরিক, হানিবল, পঞ্চম চার্লস, তৈমুর, গজনি-মহম্মদ প্রভৃতি সকলেই দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। আর্য্যসাহিত্যে সেইরূপ দিগ্বি-জয়ী বীরের দৃষ্টান্ত নাই? দিলীপপুত্র রঘু, রামচন্দ্র, পঞ্চ পাণ্ডব, কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের দিগ্বিজয় কি? এই দিগ্বিজয় সমস্ত কেবল যজ্ঞসমাধানার্থ গৃহীত হইয়াছিল। রঘুর দিগ্বিজয় বিশ্বজিৎ যজ্ঞব্যয়-নির্ব্বাহার্থে; রামচন্দ্রাদির, অশ্বমেধ; পাণ্ডবগণের রাজসূয় ও অশ্বমেধ, এবং কর্ণের দিগ্বিজয় দুর্য্যোধনের রাজসূয়যজ্ঞসমাধার জন্য। তাঁহারা কেবল লোভের পরতন্ত্র হইয়া পৃথিবীকে শোণিত-স্রোতে ভাসাইয়া দেন নাই। তাঁহাদের দিগ্বিজয় অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত, অর্থসংগ্রহ কেবল ভূরিদানের নিমিত্ত। পারমার্থিক উদ্দেশে যাহা গৃহীত, তাহার অধ্যয়ন-ফল তত মন্দ নহে।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বীরত্ব।

সমর নহিলে পুরুষত্বের প্রতিষ্ঠা এবং জয়লাভ হয় না; জয়-লাভ নহিলে বীরত্বের বিকাশ হয় না। যৌবনে মানসিক রিপু-গণের ঘোর প্রমত্ততা ও প্রকোপ হইলে, জিতেন্দ্রিয় ও আত্ম-সংযমী আর্য্যগণ সেই রিপুকুলের সংগ্রামে তপস্যাবলে একনিষ্ঠ

ও অবিচলিত থাকিয়া যে জয়লাভ করিতেন, সেই জয়লাভে তাঁহাদের আভ্যন্তরিক বীরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইত। তপস্যা দ্বারা এই রূপ জয়লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বীরত্ব দেখাইয়া দেবত্বলাভ করিতেন। মহাভারত বলেন, বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের নিত্যধর্ম্ম। সামবেদে অন্তর্যাগানুষ্ঠান পূর্ব্বক নারায়ণের উদ্দেশে পশুরূপ রিপুসমুদায়ের ছেদন করিবার বিধি বিহিত আছে। ব্রাহ্মণবীরত্ব এইরূপ অন্তর্যাগ ও আভ্যন্তরিক সমরে জয়লাভ। রামচন্দ্র কোথায় আজ রাজমুকুট ধারণ করিবেন, না, পিত্রাদেশ হইল, তাহাকে বনবাসে যাইতে হইবে। রাজঐশ্বর্য্যে ও রাজভোগে রাম এত নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত যে, তিনি তদ্দণ্ডেই বনে যাইতে প্রস্তুত; প্রস্তুত কি? তদ্দণ্ডেই তিনি দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী হইয়া বনবাসে গেলেন। তৎপরে চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া তিনি সেই ব্রহ্মচর্য্যে একনিষ্ঠ থাকিয়া ব্রাহ্মণবীরত্বের একশেষ দেখাইয়াছিলেন। যৌবনের কোন রিপু ও সুখবাসনা তাঁহাকে একদিনের তরে বিচলিত করিতে পারে নাই। আর ব্রহ্মচর্য্য দেখ ভীষ্মদেবে; বল ও বিক্রমে পরিপূর্ণ ভীষ্মদেব চিরকাল সংযমী হইয়া চিরব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। চিরকুমার শুকদেবের ব্রহ্মচর্য্যে তদ্রূপ অতিমানুষ সংযমবল লক্ষিত হইয়াছে। সনক, বালখিল্যাদি সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ চিরকুমারের যে ব্রহ্মচর্য্যবল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অনেক ক্ষত্রিয়বীরে তাহা দেখা গিয়াছে। এমত কি, অনেক হিন্দু বালবিধবা চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া মহাশ্বেতার ন্যায় চিরব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। এই সংযমবলই পুরুষত্ব এবং হিন্দুললনার মহাশক্তি। রামচন্দ্র জানিতেন

যে, যে পুরুষত্ব এবং ক্ষত্রিয়বীর্য্যে তিনি ভূষিত, সেই মহাবলে তিনি অনায়াসে সুন্দরী সীতা সমভিব্যাহারে বহুকাল বনবাসে কাটাইতে পারিবেন। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে যে ধৈর্য্য, সংযম, ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক, তাহা ছিল বলিয়া এবং একাকীই বনবাসে সুন্দরীরক্ষায় সমর্থ ছিলেন বলিয়া, তিনি ততকাল সীতার সহিত বনবাসে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন। এই বনবাসে তাঁহার সমস্ত আভ্যন্তরিক বল এবং ক্ষত্রিয়বীর্য্যের পরিচয় হইয়াছিল।

রামচন্দ্রে শুধু কি ব্রাহ্মণবীরত্বের বিকাশ? তিনি ক্ষত্রিয়বীরত্বেও প্রধান। আভ্যন্তরিক রিপুগণকে শাসন ও দমন করা যেমন ব্রাহ্মণবীরত্ব, বাহ্যরিপুগণকে শাসন ও দমন করা তেমনি ক্ষত্রিয়বীরত্ব। মানসিক রিপুগণ প্রবলমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহ্যাবয়বে যখন রাবণ ও দুর্য্যোধনাদিরূপে প্রকটিত, এবং বিক্রমশীল হইয়া পৃথিবীকে নিপীড়িত ও ভারগ্রস্ত করে, তখন সেই বাহ্যাবয়বী রিপুগণকে দমন করা এবং তাহাদিগকে সমরে পরাস্ত করিয়া জয়লাভ করাই ক্ষত্রিয়বীরত্ব। রিপুপরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত ঘোর সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করাই পার্থিব বাহ্যসমর। আর্য্যকবিগণ এই প্রকার সমরের বিরাট বর্ণনা করিয়া ক্ষত্রিয়বীরত্বের উজ্জ্বল ছবি রামায়ণে ও মহাভারতে দিয়া গিয়াছেন। রামচন্দ্র নিজ পুরুষত্বরক্ষার নিমিত্ত এবং ভূভারহরণার্থ রাবণের সহিত যে ঘোর যুদ্ধ বাধাইয়াছিলেন, সেই যুদ্ধে জয়লাভ এবং রাবণবধ করিয়া একদা ক্ষত্রিয়বীরত্ব এবং পুরুষত্বের প্রতিষ্ঠাস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজিও জগৎ তাঁহার সেই বীরত্ব ও পুরুষত্বের যশোঘোষণা করিতেছে।

রামশরীরে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বীরত্বের একত্র সম্মিলন

দেখিতে পাই। রামের শিক্ষা, বিদ্যা ও তপস্যা তাঁহাকে এই দ্বিবিধ বীরত্বেই ভূষিত করিয়াছিল। তিনি যেমন ধীর, শান্ত-প্রকৃতি, স্থিরচিত্ত ও বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনই উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মঠ এবং বীরত্ব-পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি পিতৃদৃষ্টান্তে যে সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিতেন, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ তাঁহাকে যে সংযম ও নির্লেপ শিক্ষা দিতেন, তিনি সেই দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় বিনীত হইয়া ব্রাহ্মণবীরত্বের যোগ্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপরিসীম বলবিক্রমে এবং ধনুর্ব্বেদ বিদ্যালাভে তিনি ক্ষত্রিয়বীরপ্রধান হইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে আর্য্যভূমিতে ক্ষত্রিয়রাজকুলে এই দ্বিবিধ শিক্ষাই প্রদত্ত হইত। তাই আমরা দেখিতে পাই, কেবল রামচন্দ্র কেন, আর্য্যসাহিত্যে অনেক রাজর্ষিগণ বিরাজিত। তপোধনাগ্রগণ্য নারদ সৃঞ্জয়কে পুত্রশোকে একান্ত কাতর দেখিয়া সেই সকল রাজর্ষিচরিত্র তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন।

অনেক ক্ষত্রিয়রাজ ব্রাহ্মণবীরত্বে কৃতকার্য্য হইয়া যেমন রাজর্ষি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তেমনি অনেক ব্রাহ্মণ পরশু-রাম এবং দ্রোণের ন্যায় আবার ক্ষত্রিয়বীর্য্যধারণ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ভীষ্মদেব বলিয়াছেন, মহারাজ মুচুকুন্দ ব্রাহ্মণের মন্ত্র ও তপোবল এবং ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র ও ভুজবল একত্র করিয়া প্রজাপালন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠের ব্রহ্মবল অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি স্ববাহুবলনির্জ্জিত বসুন্ধরা শাসন করিতেন। বাস্তবিক, সেকালে ভারতে রাজছত্র ধারণ করিতে হইলে হিন্দুরাজকে এই দ্বিবিধ বলেই সম্পন্ন হইতে হইত। সনৎকুমার বলিয়াছিলেন, যেমন অনল অনিলের সহিত সমাগত হইলে সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর মিলিত হইলে সমুদায়

শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। রামচন্দ্রে এই রাজাদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। রামচন্দ্রে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বল একত্র মিলিত হইয়াছিল। ইউরোপে কি সে আদর্শ আছে? কোন কোন রোমীয় ভূপতি সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সামান্য সরল ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রামের মত রাজ্যে অভিষেকের সময়ে নহে। রামের সংযম ও তপস্যাবলের সহিত তাঁহাদের কার্য্যের তুলনাই হয় না।

বীরত্বে সমর ও রক্তপাত।

কি ব্রাহ্মণ বীরত্ব, কি ক্ষত্রিয় বীরত্ব, কি আসুরিক বীরত্ব, সমস্ত বীরত্বেই অনেক স্থানে রক্তপাত আছে। ব্রাহ্মণবীরত্ব লাভের জন্য কর্ত্তব্যবুদ্ধি কোন কোন স্থানে মহা সমরাদি প্রজ্বলিত করিয়া রক্তপাত আনিয়াছে। তপস্যায় কর্ত্তব্যবুদ্ধির বল ও বিক্রম বিকাশ। এই কর্ত্তব্যপালনে নিয়োজিত হইয়া শিবি আশ্রিত কপোতকে শ্যেনের কবল হইতে রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যাবল, কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও ধর্ম্মতেজ কত প্রবল, শ্যেন-কপোতের দৃষ্টান্তে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন আমরা শিবিচরিত্রের এই মহা দৃষ্টান্ত পাঠ করি, তখন আমরা ভাবি না, তাহা সত্য কি মিথ্যা; শিবির আত্মবলিতে এবং তাঁহার গাত্র হইতে খণ্ড খণ্ড মাংসচ্ছেদে, তাঁহার ধর্ম্মবল, তপস্যা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির বিক্রম দেখি। কল্পনা তাহাতে পূর্ণ হয়; বিচারশক্তি ভুলিয়া যাই। সেই কল্পনায় শিবিচরিত্রের প্রচণ্ড ধর্ম্মতেজের মাহাত্ম্যসংস্কার চিরদিনের জন্য জাগরূক থাকে। কাব্যকল্পনার এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ইউরোপীয় কবিগণ অনুভব করিতেও

পারেন না। আর্য্যচরিত্রে ধর্ম্মতেজ কত উচ্চতায় উঠিতে পারে, আর্য্যবীরত্ব কত দূর সীমায় যাইতে পারে, তাহা বিলাতী কবিগণের কল্পনায়ও আসে না। তাই সেক্সপিয়ার এমত দৃষ্টান্ত পাইয়াও তাহার উচ্চতায় উঠিতে পারেন নাই; তিনি সে রক্তপাতের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন নাই। তাই, শ্যেনরূপী শাইলক গাত্রমাংস চাহিলে, কবি রক্তপাত করাইতে পারিলেন না। পারিলেন না কেন? তিনি মূলেই কাব্য-কল্পনায় ধর্ম্মরাগ দিতে পারেন নাই; তিনি যে গল্প সাজাইয়াছিলেন, সে গল্পে গাত্রমাংস প্রদত্ত হইলেও আত্মবলি ঘটিত না। তাই তিনি পোসিয়াকে সং সাজাইয়া রং করাইয়া সুগভীর রসপূর্ণ কাব্য-কল্পনার পর্য্যবসান করিলেন। কিন্তু আর্য্যসাহিত্যে কি দেখি? আর্য্যসাহিত্যে দেখি, ধর্ম্মমাহাত্ম্য ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি শিবিচরিত্রে রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া চিরকাল মানবকল্পনায় স্বর্ণরেখার ন্যায় উজ্জ্বলিত রহিয়াছে।

রক্তপাত দেখ ভৃগুরামের মাতৃহত্যায়। কেন তিনি মাতৃহত্যায় প্রবৃত্ত হইলেন? পিত্রাদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত। আর্য্যশাস্ত্রে কর্ত্তব্য দুইরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—শাস্ত্রাদেশ ও গুরুর আদেশ। যখন শাস্ত্রজ্ঞান জন্মিবার অধিকার জন্মে নাই, তখন গুরুর আদেশই কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। পিতা মাতার আদেশ অবশ্য পালনীয়। ভৃগুরাম তাহা পালন করিলেন; দাশরথি রাম ও পাণ্ডবেরা তাহা পালন করিয়াছেন। সেই পিত্রাদেশের গুরুত্ব দেখাইবার নিমিত্ত ভার্গব মাতৃহত্যা পর্য্যন্ত করিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ তেজের অবতার। ভার্গব যেমন ব্রাহ্মণ তেজের অবতার, দাশরথি তেমনি ক্ষত্রিয় বীর্য্যের অবতার।

ব্রাহ্মণ তেজের বীরত্ব আভ্যন্তরিক সমরে, ক্ষত্রিয় বীর্য্যের প্রাধান্য বাহ্য রণে। তাই ভৃগুরাম বাহ্য সমরে দাশরথির নিকট বিনা-যুদ্ধে পরাস্ত।

ধর্ম্মার্থ বলি।

আর্য্যসাহিত্যে বৃথা রক্তপাত নাই; সমস্ত রক্তপাত ধর্ম্মার্থ। এই কথা বঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে এত বিশদ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইল। ধর্ম্মার্থ যে রক্ত-পাত, তাহা দেবকার্য্য। এজন্য তাহার নাম বলি। এই বলি-দানের পবিত্রতা সেক্সপিয়ার পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিলেন। তিনি ব্রুটসের মুখ দিয়া তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। সিসরকে মারিবার জন্য লোভী ক্যাসস্ প্রভৃতি নানা সম্ভ্রান্ত রোমীয়গণ দলবদ্ধ হইয়াছিল। ব্রুটসকে তাহারা দলভুক্ত করিয়া লইল। মহান্ ব্রুটস তাহাদের মন্ত্রণায় ধর্ম্মবলির পবিত্রভাব এইরূপ আরোপ করিতে-ছেন :—

"Our Course will seem too bloody, Caius Cassius,
To cut the head off, and then hack the limbs;
Like wrath in death, and envy afterwards:
For Antony is but a limb of Cæsar.
Let us be sacrificers, but no butchers Caius.
We will stand up against the spirit of Cæsar;
And in the spirit of men there is no blood:
* * * *
Let us carve him as a dish fit for the Gods,
Not hew him as a carcase fit for hounds:
* * * This shall make

Our purpose necessary, and not envious :
Which so appearing to the common eyes,
We shall be called purgerers, not murderers."

ব্রুটস বলিতেছেন, ধর্ম্মার্থ যে রক্তপাত, তাহা আবশ্যক, তাহা বিদ্বেষকৃত নহে। জরাসন্ধবধে বঙ্কিম এই কথাই বুঝাইয়াছেন। এই কথার প্রশস্ত দৃষ্টান্ত কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ। পাছে অনাবশ্যক রক্তপাত হয়, তজ্জন্য কি পাণ্ডবেরা, কি ভীষ্মাদি কুরুপক্ষীয়েরা, উভয়েরাই অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। বিনা যুদ্ধে দুর্য্যোধন স্থচ্যগ্রবেধ্য ভূমিও প্রদান করিবেন না। কাজেই যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইল।

কুরুক্ষেত্রের ব্যাপারে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু সেক্স-পিয়ারের নাটকে কি যুদ্ধ ঘটিয়াছিল? না, সিসরকে হত্যা করা অত্যাবশ্যক হইয়াছিল? তাঁহাকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ক্যাসস্ প্রভৃতি কতিপয় লোকে যখন মন্ত্রণাজালে আবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, তখন তাহারা প্রথমে কিরূপ প্রবৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়াছিল? ব্রুটসই বলিতেছেন, আমাদের কার্য্যে যেন ক্রোধ ও হিংসার পরিচয় না হয়; তজ্জন্য তিনি তাহাতে ধর্ম্মের পরিচ্ছদ পরাইয়া সেই হিংসা ও ক্রোধ ঢাকিতে চান। তিনি বলিলেন, লোকে যেন বলে, আমরা সিসরকে ধর্ম্মার্থ বলি দিয়াছি, হত্যা করি নাই। স্বদেশের হিতার্থ ব্রুটসের প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া থাকিবে; কিন্তু ক্যাসসের উদ্যোগ তদ্রূপ ছিল কি? ক্যাসস্ প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিগণ হিংসা ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া প্রথমে যে সংকল্প করে, ব্রুটস তখন কোথায়? যে ভাবে ব্রুটস সেই মন্ত্রণায় যোগ দিন না কেন, ক্যাসস্ দেখিয়াছিল, তাহাতে

উদ্যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে না, যে রূপে হউক, সিসর নিহত হইবেন। কাপুরুষের মত তাহারা একদা সিসরকে নির্দ্দয় কসাই-য়ের মত খুন করিল। এরূপে নিহত ও রক্তপাত না করিয়া কিরূপে স্বদেশের হিতসাধন হইতে পারে, ব্রুটস এক দিন, এক মুহূর্ত্তও সে চেষ্টায় ফেরেন নাই। তবে আর কিরূপে বলিব, সিসরের হত্যাকাণ্ড অলঙ্ঘনীয় হইয়াছিল, এবং সিসরের হত্যায় বৃথা রক্তপাত হয় নাই ?

এই স্থলে আমরা গ্রীক ট্র্যাজিডির প্রথম উৎপত্তির কারণে উপনীত হইলাম। ধর্ম্মার্থ বলি লইয়া, গ্রীক ট্র্যাজিডির প্রথম সূত্রপাত হয়। এসকাইলস এবং ইউরিপাইডিসের কতিপয় ট্র্যাজিডি এই ধাতুতে গঠিত। তাঁহারা ভাবিতেন, ধর্ম্মার্থ বলি দিলে ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়। আর্য্যসাহিত্যেও যে ধর্ম্মার্থ বলি নাই, এমত কথা নহে। কর্ণ ও শিবি অতিথিসৎকারার্থ নিজ নিজ পুত্রকে বলি দিতে কাতর হয়েন নাই। রাজা ময়ূরধ্বজ তজ্জন্য নিজ দক্ষিণাঙ্গ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যের এরূপ রক্তপাত ও ধর্ম্মবলি মায়িক ব্যাপার মাত্র। এই ধর্ম্মবলিসমস্ত পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। পৌরাণিকেরা একদা ধর্ম্মের গৌরব, এবং ভগবানের প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য সেরূপ আলৌকিক ব্যাপারের উদ্ভাবন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা ভক্তগণের ভক্তি-পরীক্ষা এবং ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকাশ হইয়াছে। পুরাণে এরূপ ব্যাপারের স্থান হইতে পারে। কিন্তু গ্রীক ট্র্যাজিডিতে সেরূপ ধর্ম্মবলির আর ত পুনর্জ্জীবন লাভ হয় নাই। হইলে, তাহা আর ট্র্যাজিডি হইত না। ট্র্যাজিডির পর্য্যবসানে নির্দ্দয় রক্তপাত চাই। সেরূপ রক্তপাতে হৃদয় কম্পিত এবং শরীর শিহরিয়া

উঠে? না, ধর্ম্মগৌরবে শরীর পুলকিত হয়? ট্র্যাজিডির সূত্রপাত যাহাই হউক, ইউরোপে তাহা ক্রমে কেমন দূষিত হইয়াছিল, তাহা আমারা প্রথম প্রস্তাবে প্রদর্শন করিয়াছি।

বীরের প্রতিজ্ঞা-বল।

আর্য্যগণ স্বধর্ম্মরক্ষার্থ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া সেই সংকল্প সিদ্ধ করিতেন। মনুষ্যত্বের এই নিদর্শন, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাবলে পরিচিত হইত। আর্য্য-সাহিত্যে এই মনুষ্যত্বের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। প্রতিজ্ঞা-পালনেই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং বীরের বীরত্ব। ব্রাহ্মণ কর্ত্তব্য-পালনে কখন পরাঙ্মুখ নহেন। পরশুরাম পিতৃভক্তিতে চালিত হইয়া পিতৃবধের প্রতিশোধার্থ যে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া তিনি ক্ষত্রিয়রুধিরে পিতৃ-তর্পণ করিয়াছিলেন। পরশুরামে আমরা ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞাবলের মহাতেজ দেখিতে পাই। প্রতিজ্ঞায় কি না হয়? সীতা উদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া রামচন্দ্র কি অসাধ্য সাধনই না করিয়াছিলেন! ভীষ্মদেব পিতৃসন্তোষার্থ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চিরদিনের জন্য ভোগসুখ ও রাজসিংহাসন পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনবধের জন্য যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা-রবে পাণ্ডবগণ কম্পিত হইয়াছিলেন। কর্ণ সেই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রলাভার্থ দ্রোণের নিকট অপমানিত হইয়া সুদূর মহেন্দ্র পর্ব্বতে পরশুরামের সমীপে গিয়াছিলেন; গিয়া কত অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত হইয়া এবং কত কষ্ট সহ্য করিয়া তবে সেই অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এদিকে অর্জ্জুনও

কর্ণবধার্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য ভ্রমণ করিয়া তবে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসেন। অভিমন্যুবধের পর সেই অর্জ্জুন যখন সূর্য্যাস্ত হইবার পূর্ব্বে জয়দ্রথবধের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর শক্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া কৃষ্ণ পর্য্যন্তও কম্পিত হইয়াছিলেন; সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞা-প্রভাবে কুরুশিবির মহা আতঙ্কে আলোড়িত হইয়া কেমন ঘোর রণসজ্জা করিয়াছিল, সঞ্জয় সুবিস্তৃত বৃত্তান্তে তাহা মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। দুঃশাসনের রুধির-পানে ভীমের প্রতিজ্ঞাবল প্রকটিত। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতিজ্ঞায় দ্রোণ পর্য্যন্ত পতিত। দ্রোণের পতনে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা। কেমন বীভৎস ব্যাপারে পাঞ্চালগণকে নিহত করিয়া অশ্বত্থামা নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন, মহাভারতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হংসধ্বজ স্বীয় পুত্র সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রতিজ্ঞায় অনেক রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু তাহাতে মানুষ-প্রতিজ্ঞার কেমন প্রভূত বল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বীরের সেই প্রতিজ্ঞা-প্রভাব যত দিন থাকে, তত দিন দেশ সুরক্ষিত। ক্ষত্রিয়ের প্রতিজ্ঞাবলে পূর্ব্বকালে ভারত কম্পিত হইত। সেই প্রতিজ্ঞাবল গিয়াছে, ভারতও উৎসন্ন গিয়াছে। আবার বলি, এই প্রতিজ্ঞাবলে মানুষের মনুষ্যত্ব এবং বীরের বীরত্বের বিকাশ।

বিনা রক্তপাতে বীরের সত্যপালন।

সত্যপালনেও এই প্রতিজ্ঞাপ্রভাব। রামচন্দ্র বনবাসে আদিষ্ট হইয়া যে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা হইতে কি কেহ তাঁহাকে বিচ্যুত করিতে পারিয়াছিল? পিত্রাদেশই তাঁহার

ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম হইতে তাঁহার মাতা, স্ত্রী, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, কুলগুরু প্রভৃতি কেহই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। ভরত নিশ্চা এত যে তাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিল, সে আরাধনার কোন ফল ফলে নাই। রাম ব্রহ্মচর্য্যব্রত কিছুতেই পরিত্যাগ করিলেন না। ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাকে সেই ব্রতধারণে উত্তেজিত করিয়াছিল। সেই ধর্ম্মজ্ঞানে তিনি রাজসিংহাসন, রাজমুকুট ও রাজভোগ এক দিনে পরিবর্জ্জন করিয়া আসিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। রাজ্যভোগের সুখ, তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন। হৃদয়ের বল এত, রামের নিস্পৃহতা এতই প্রবল যে, সেই বলে বলীয়ান হইয়া রামচন্দ্র, সকল লোভ, সকল লালসা, সকল ভোগ অনায়াসে এক দিনে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত পরিহার করিলেন। সত্যপালনের নিমিত্ত এইরূপ প্রতিজ্ঞাই ত চাই। আর সেই হৃদয়ের বল দেখ, সীতাকে বনবাসকালে এবং লক্ষ্মণবর্জ্জনসময়ে। যিনি প্রজাপালনে নিযুক্ত, সেই ক্ষত্রিয়রাজের আবার নিজ বাসনার চরিতার্থতা কি ? সেই ব্রতে বুঝি সকল সুখ আহুতি দিতে হয়। তাই রামচন্দ্র তেমন প্রেমময়ী সীতাকেও বনবাসে দিলেন। তাঁহার সমুদয় হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইল, তথাপি অযোধ্যার সম্রাট প্রজার মনোরঞ্জন করিতে পরাঙ্মুখ হইতে পারিলেন না। যে সত্যপালনে রাজা দশরথ দৃঢ়ব্রত হইয়া রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, বনবাস দিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিলেন, আজি রামচন্দ্রও রাজধর্ম্মে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সীতাকেও বনবাস দিয়া মৃতপ্রায় হইয়া রহিলেন। দশরথ নিজ পত্নীর নিকট সত্য করিয়াছিলেন যথার্থ, কিন্তু সত্য-পালন সামান্য কার্য্য নহে। স্ত্রীর নিকটেই সত্য হউক,

আর অপর লোকের নিকটই সত্য হউক, যাঁহারা সত্যব্রত, সত্যই তাঁহাদের জীবন। তদ্রূপ সামান্য সূত্রে যুধিষ্ঠিরের সত্য। সামান্য দুরোদরে তিনি সমস্ত রাজ্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সংসার, এমত কি প্রাণের কলত্র পর্য্যন্ত হারাইয়াছিলেন; হারাইয়া বার বৎসর বনবাস স্বীকারে পণ করিলেন। সে পণেও যুধিষ্ঠির জয়লাভ করিতে পারিলেন না। সুতরাং সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহাকে বনবাস যাইতে হইবে। কিসের জন্য এই সত্য? যার জন্য হউক না কেন, যখন ধর্ম্মপুত্র একবার সত্য করিয়াছেন, সে সত্য হইতে তাঁহাকে কে টলাইতে পারে? সমস্ত সংসার নহে। যে আন্তরিক যুদ্ধে রামচন্দ্র জয়ী হইয়াছিলেন, সেই আন্তরিক যুদ্ধের তুমুলকাণ্ড বিকাশ করিয়া দেখাইবার জন্য, ব্যাস বুঝি দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার কল্পনা করিলেন। সেই লাঞ্ছনার সমক্ষে যুধিষ্ঠির দণ্ডায়মান। এক দিকে তাঁহার সত্য, অন্য দিকে সমস্ত সংসারের প্রতীপবল। যুধিষ্ঠিরের অন্তর ঘোর যুদ্ধে তোলপাড় হইতেছে; তথাপি সেই যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অচল, অটল। সেইরূপ যুদ্ধে ধর্ম্মপুত্র অটল বলিয়া তাঁহার যুধিষ্ঠির নাম সার্থক হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ে সত্যের জয় হইল, শত্রুসভামধ্যে, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরীক্ষা হইল, যুধিষ্ঠির বিজয়ী হইয়া জগতে সত্যপালনের জয়ঘোষণা করিলেন।

বিনা রক্তপাতে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞাপালন।

গুরুদক্ষিণা আহরণ জন্য ব্রাহ্মণেরও ত্যাগ-স্বীকার। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালনে শিষ্যগণের অন্তরে কত দূর সংযম, ধৈর্য্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি হৃদয়বল লব্ধ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষার নিমিত্ত গুরুগণ সেকালে গুরুদক্ষিণায় শিষ্যগণকে অসাধ্যসাধনে নিয়োজিত

করিতেন। তপোধন উতঙ্ক গুরুদক্ষিণার্থ মহর্ষি গৌতমের আদেশে তদীয় পত্নী অহল্যার নিকট সমুস্থিত। অহল্যা না জানিয়া শুনিয়া তাঁহাকে এক অসাধ্যসাধনে প্রেরণ করিলেন। তিনি সৌদাসরাজমহিষীর কর্ণস্থিত কুণ্ডলদ্বয় চাহিলেন। উতঙ্ক সেই কথাই স্বীকার করিয়া যে সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়াছিলেন, মহাভারতীয় আশ্বমেধিক পর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। উতঙ্ক গুরুগৃহবাস-কালে যে দমগুণে ভূষিত হইয়াছিলেন, যে তপোবল লাভ করিয়াছিলেন, সেই বলপ্রভাবে এবং মহর্ষি গৌতমের প্রসাদবলে তিনি বশিষ্ঠ দেবের শাপে রাক্ষসরূপধারী সৌদাস-রাজমহিষীরও কুণ্ডলদ্বয় সংগ্রহ করিয়া গুরুগৃহাভিমুখে যাইতে-ছেন, এমত সময় পথিমধ্যে সেই কুণ্ডলদ্বয় ভুজঙ্গ কর্তৃক কবলিত হইলে উতঙ্ক মুনিকে অশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। তথাপি মুনি সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নাগলোক হইতে সেই কুণ্ডলদ্বয় সমুদ্ধার পূর্ব্বক অহল্যাকরে অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে যে আন্তরিক বল ও বীর্য্য লাভ করিয়া-ছিলেন, তদ্দ্বারাই তিনি বীরোচিত অসাধ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। আর্য্যসাহিত্যে গুরুদক্ষিণাহরণার্থ এইরূপ তপো-বললব্ধ বীরত্বের দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

মহাকাব্যের বীরত্ব।

আর্য্যসাহিত্য যে সমস্ত বীরত্বের আদর্শে পরিপূর্ণ, মহাভরত ও রামায়ণে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার সমুদায় চিত্র অঙ্কিত করিতে এক একখানি বিশাল রামায়ণ ও মহাভারতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সমুদায় ব্যাখ্যা এই ক্ষুদ্র

প্রবন্ধের প্রসার মধ্যে সম্ভব নহে। মহাভারতই প্রধানতঃ বীর-রসে প্লাবিত। আর্য্যসাহিত্যে যেমন প্রেমের মধুরতা, তেমনি বীরত্বের ওজস্বিতা। প্রেম-কল্লোলিনী, সরস্বতীর ধীর স্রোতে প্রবাহিত; বীরতরঙ্গ, ব্রহ্মপুত্রে নিনাদিত। ভবভূতি ও কালি-দাসে প্রেমের সুতরঙ্গ হিল্লোলিত; বাল্মীকি ও ব্যাসে বীরত্বের প্রবাহবেগ উচ্ছলিত। এই বীররস উন্মত্ততায় উঠিয়া একদা উত্তাল তরঙ্গে গগনস্পর্শ করিতে যেন উদ্যত হইয়াছে। কুরু-ক্ষেত্রের মহাসমরের এই উন্মত্ততা। ব্যাস মহানির্ঘোষে ওজস্বিনী ভাষায় যে বীররসের উৎস উৎসারিত করিয়াছেন, অর্জ্জুনের দেবদত্ত এবং বাসুদেবের পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদে তাহা চালিত করিয়া জগতীতল, আকাশ, পাতাল ও দিক্‌পালগণকে বিকম্পিত করিয়া মহাসিংহনাদে সমরসাগরে সমগ্র ভারতকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

ত্রিবিধ বীরত্ব।

আমরা প্রেমের যে ত্রিবিধ গতি দেখাইয়াছি, বীরত্বেও তাই। মানবে কখন পশুর উন্মত্ততা ও বীরত্ব, কখন তাহার বীরত্ব দেবোপম, কখন সেই বীরত্বে মনুষ্যত্বের বিকাশ। যখন মানবের রিপুসকল অত্যন্ত প্রবল হয়, তাহার লোভ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়, তাহার কাম সতীকেও স্পর্শ করিতে গিয়া তাঁহাকে কলঙ্কিত করিতে যায়, তাহার দর্পভরে পৃথিবী বিকম্পিতা হয়, তাহার রোষানল দিগ্দশ দগ্ধ করিতে যায়, তাহার অমর্ষের অসি ধরণীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করে, তখনই মানবের পশুবৎ বীরত্ব প্রকটিত। আর যখন মানব উচ্চ গুণে

বীর, যখন তিনি বিশ্বপ্রেমে ও দয়াতে দানবীর, বলির ন্যায় সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য দান করিয়াও যেন তৃপ্ত নহেন, কখন রঘুর মুক্ত হস্তে কুবের-ভাণ্ডারের ন্যায় নিজ ভাণ্ডার সমস্ত বিতরণ করিতেছেন, কখন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে দানধর্ম্মের ও দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন, যখন মানব ক্ষমাগুণে ভূষিত হইয়া দ্রৌপদীর মত নিজ পঞ্চশিশুহত্যাকারী অশ্বত্থামার বন্ধন-মোচনে প্রবৃত্ত, যখন তাহার আশ্রিতের প্রতি অনুকম্পা শিবি রাজার ন্যায় নিজ গাত্রমাংস দিয়া তুলায় কপোতকে ওজন করিয়া শ্যেনকে পরিতুষ্ট করিতে সমুদ্যত, যখন তাহার নিবৃত্তিসুখ ভীষ্মের মত বীরকেও চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতে নিরত রাখিতে পারে, যখন তাহার স্বধর্ম্মজ্ঞান উদারতায় উত্তোলিত হইয়া একদা দুর্য্যোধনের ন্যায়, অর্জ্জুনরূপী নিজ শত্রুকেও যাহা প্রার্থিত, তাহাই অকাতরে দিতে পারে, যখন মানব কর্ণরূপে দেবেন্দ্রকে নিজ জীবিত-সর্ব্বস্ব কুণ্ডল কবচ স্বশরীর হইতে মোচন করিয়া দিতে, নিবারিত হইলেও, অনায়াসে তাহা ধর্ম্মজ্ঞানে দান করিতে পারেন, তখনই তিনি দেবোচিত বীরত্বের বিকাশ দেখান। আবার যখন মানব দেবত্বোন্মুখ হইয়া সত্যপালনব্রতে প্রতিজ্ঞারূঢ়, এবং যখন সেই সত্যপালনে নিয়োজিত হইয়া স্বধর্ম্ম, কুল, মান ও মর্য্যাদারক্ষার্থ রক্ষঃ ও কুরুকুল ধ্বংস করিয়াছেন, ধর্ম্মার্থ পৃথিবীর ভার মোচন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ গণের আশ্রমপীড়ানিবারণার্থ দানবদৈত্যকে নিপাত করিয়াছেন, প্রজারঞ্জনার্থ নিজ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণীকেও পরিহার করিয়া-ছেন, যুদ্ধার্থ যে কেহ উপস্থিত হউক না, আত্মীয়, স্বজন ও গুরুজন নির্ব্বিশেষে স্বধর্ম্মনিয়মানুসারে তাহাকেই যুদ্ধ দান

করিয়া হয় ত প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যখন স্বধর্ম্মানুসারে স্বদেশ ও স্বরাজ্যরক্ষার্থ তুমুল সংগ্রাম বাঁধাইয়া বভ্রুবাহন নিজ বীর পিতার সহিতও যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, যখন কর্ত্তব্য ও স্বধর্ম্মরক্ষার গৌরব রক্তরাগে বীরত্বে উঠিয়াছে, তখনই তাহার মনুষ্যোচিত বীরত্বের বিরাট বিকাশ। ইউরোপে স্বধর্ম্ম এবং স্বদেশ রক্ষার্থ নিয়োজিত Martyr এবং Patriot গণ এইরূপ মনুষ্যোচিত বীরত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহারা ইউরোপীয় সাহিত্যের গৌরব।

আর্য্যবীরের বিশেষত্ব।

কিন্তু ইউরোপীয় বীরের সহিত আর্য্যবীরের প্রভেদ কোথায়? ব্যাস এক স্থলে তাহা অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা ইউরোপীয় ইতিবৃত্তে অনেক গৃহযুদ্ধের বিবরণ পড়িয়াছি, কিন্তু কোন যুদ্ধে ত অর্জ্জুনের মত সমরকালে কোন বীরকেই তেমন হৃদয়-বেদনায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দাঁড়াইতে দেখি নাই। অর্জ্জুন যুদ্ধে আসিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি গুরুগণ দণ্ডায়মান। অর্জ্জুনের শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হইল। অথচ তাঁহারা যুদ্ধার্থ উপস্থিত। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এই, যুদ্ধার্থ যিনি সম্মুখীন হইবেন, তাঁহার সহিতই রণ করা কর্ত্তব্য। সুতরাং অর্জ্জুনের হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। বাহ্যসমরে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে আভ্যন্তরিক সমরে জয়লাভ করিতে হইবে। এমন উন্মত্ততার সময়ে পৃথিবীর কোন্ বীরের হৃদয়ে এরূপ হৃদয়-বেদনার উচ্ছ্বাস উঠিয়া আন্তরিক সমর প্রধূনিত করিয়াছে? এ ঘটনা কিসের নিদর্শন? এ ঘটনা কি

দেখাইয়া দিতেছে না, পূর্ব্বকালে আর্য্যবীরগণ কেমন উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন? তাঁহারা কি শুধু বাহ্যসমরের নিমিত্ত শিক্ষালাভ করিতেন? তাঁহাদের আভ্যন্তরিক তপোবল কোথা হইতে আসিত? তাঁহারা ভক্তিতে প্রবুদ্ধ হইয়া জিতেন্দ্রিয় হইতেন কোন্ বলে? ভুজবলবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের প্রেম, ভক্তি ও শ্রদ্ধাদির অনুশীলনও বৃদ্ধি হইত। বাহ্য শত্রুকে জয় করিবার জন্য তাঁহারা যে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-শত্রু এবং পাপপ্রবৃত্তি সমুদায়কে জয় করিতে শিখিতেন। অস্ত্র-বলে ও যুদ্ধ-নৈপুণ্যে যেমন অসুর নিপাত করিতে শিখিতেন, তেমনি শম ও দমগুণে তপস্যাবলে আন্তরিক পাশববলকে দমন করিতেন। যে বীর এইরূপ বিবিধ যুদ্ধে জয়ী, তিনিই যথার্থ বীরনামের যোগ্য। নহিলে যাঁহার হৃদয়শত্রু অজেয়, বাহ্যশত্রুর উপর জয়লাভ করিয়া তাঁহার কি ফল? তাহার শান্তি ও সুখ কোথায়? সমস্ত পৃথিবী তাহার করতলস্থ হইলেও তিনি ঘোর দুঃখী; এ পৃথিবীতে তাঁহার শান্তি নাই।

বীরের সম্পদ।

হৃদয়সমরে জয়লাভ করিয়া যাঁহারা অন্তরে শান্তিস্থাপন করিতে পারিতেন, এ পৃথিবী তাঁহাদের করায়ত্ত; তাঁহারা কিছুই চাহিতেন না। রাজসিংহাসন, কুবেরের ভাণ্ডার, সকলই তাঁহারা পাইয়াছেন। তাঁহাদের নিস্পৃহ হৃদয়ে কিছুই মোহনীয় ও লোভনীয় নহে। ভরত একদিন রাজসিংহাসন পাইয়াও তাহা তুচ্ছ করিয়াছিলেন। কত কষ্টের পর কুরুক্ষেত্র-সমরে জয়লাভ করিয়াও যুধিষ্ঠির রাজসিংহাসনে উঠিতে চাহেন নাই। ব্যাস যুধিষ্ঠিরের

এই নির্ব্বেদ উপস্থিত করাইয়া, পাণ্ডববীরগণের সেই জ্ঞানবল সম্যগ্‌রূপে বিকাশ করিয়া দেখাইলেন, যে জ্ঞানবলে তাঁহারা হৃদয়-শত্রুর উপর বিজয়ী; যে জ্ঞানবলে তাঁহারা ভোগসুখে নির্লিপ্ত হইয়া, সংসার ও রাজধর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, এমন কি, দ্রৌপদীরও বাক্যে সেই জ্ঞানবলের বিক্রম প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, যাহা নারদাদি ঋষিগণের মহা তপোবল, সেই জ্ঞানপ্রভাব পাণ্ডবগণের কথায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই সংযম-শক্তিপ্রভাবে ইন্দ্রিয়জয়ী হইয়া নিজ তপস্যাগুণে হৃদয়, মনকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিয়াছেন, বশীভূত করিয়া, দেবত্বলাভে জীবন সার্থক করিয়াছেন, পার্থিব সেনাবল ও ভুজবল তাঁহাদের অভাব হয় না। মুহূর্ত্তমাত্রে তাঁহারা সহস্র সেনানী সংগ্রহ করিতে পারেন। বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ঋষির আজ্ঞামাত্রে শত শত সেনা যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। ঋষিদিগের ঘোর যুদ্ধ বাঁধিল। কিন্তু বিশ্বামিত্র আজিও যে বশিষ্ঠের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হয়েন নাই। সুতরাং বিশ্বামিত্রের পরাজয় হইল। তৎপরে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্যলাভে কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় তপোনিরত হইলেন। ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়া বিশ্বামিত্র জ্ঞানবলে ব্রহ্মত্ব পাইলেন।

আদর্শ রাজ্য।

যে বীর যুদ্ধে শরীরপাত করেন, আর্য্যসাহিত্যে প্রতীত, তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাই দুর্য্যোধন মৃত্যুকালে পাণ্ডবগণকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণকে উপহাস করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন,

সাহিত্যে বীরত্ব।

আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর। কিন্তু দুর্য্যোধন জানিতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ ও পঞ্চপাণ্ডবগণ এই পৃথিবীতেই শত স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গের জন্য লালায়িত নহেন, স্বর্গ অপেক্ষাও যাহা উচ্চ, সেই ব্রহ্মপদলাভে তাঁহারা প্রয়াসী। মহাতপা মুদ্গল স্বর্গীয় বিমান তুচ্ছ করিয়া, যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপদ লাভের বাসনায় শমগুণাশ্রিত হইয়া জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন, যুধিষ্ঠিরাদি সেই জ্ঞানলাভের জন্য এই পৃথিবীতে রহিলেন। তাঁহারা এখনও রাজর্ষির যোগ্য হয়েন নাই; এখনও জনকের ন্যায় ভগবৎ-প্রেমে সমুদায় সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দিতে সিদ্ধিলাভ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ সেই জন্য যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সমস্ত রাজর্ষিচরিতের চিত্র অঙ্কিত করিলেন। ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে সেই পথ দেখাইয়া দিয়া, তবে দেহত্যাগ করিলেন। যে নিষ্কাম নিবৃত্তি-পথ ও বিশ্বপ্রেম শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় উপদেশ দিয়াছিলেন, আজিও পাণ্ডবদিগের তাহা সুলব্ধ হয় নাই। কই, অর্জ্জুন ত নিষ্কামভাবে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সুনির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই; দ্রোণ ও ভীষ্মাদির বিপক্ষে তিনি যুদ্ধ-সময়ে তত উদ্যোগী হয়েন নাই। রাজ্য পাইলে, তাঁহারা কি রাম ও জনকাদির ন্যায় নির্লিপ্তভাবে রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন? যদি না পারেন, তবে তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম্মে সম্পন্ন হয়েন নাই। তাঁহারা আজিও পৃথিবীতে রামরাজ্য আনিতে সক্ষম হয়েন নাই। ক্ষত্রিয় রাজা হইয়া বিশ্বপ্রেমের পরিচয় না দিলে, তবে তিনি রাজমুকুট-ধারণের যোগ্যপাত্র নহেন। বিশ্বপ্রেমাধিষ্ঠিত সেই পার্থিব

রাজ্যের ছবি, বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। সেই রাজ্য দশরথের, সেই রাজ্য ছিল রামের। আর্য্যবীর রাজ-সিংহাসনারূঢ় হইয়া, যে প্রেমরাজ্যের বিস্তার করিয়েন, রাম-রাজ্যে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সেই রাজ্যে রাম অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণসমা সীতা দেবীকেও বিসর্জ্জন দিয়া একান্ত মনে প্রজারঞ্জন করিয়াছিলেন। জগতের হিতের জন্য নিজ ইষ্ট ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। সেই রামরাজ্যে লোক স্বর্গসুখে বাস করিত। সে রাজ্য কি আর ভারতে উদয় হইবে!

সাহিত্যে দেবত্ব।

সতীর আদর্শ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যকবিগণ অনেক আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছেন; শুদ্ধ আদর্শ নহে, অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আদর্শ। সেই বিশাল আদর্শসমূহ আর্য্যবাসিগণের কল্পনাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে; এত দূর পূর্ণ যে, তাহাদের নিকট সামান্য কবি-কল্পনাপ্রসূত অন্য সদৃশ প্রতিমা দাঁড়াইতে পারে না। তুমি যত সুন্দর করিয়া সতীপ্রতিমা আঁক না কেন, সীতার স্বর্ণময়ী কল্পনার সমীপে তাহা অতি দীন বলিয়া প্রতীত হইবে; যতই প্রকাণ্ড করিয়া আঁক না কেন, দময়ন্তীর বৃহতী কল্পনার কাছে তাহা অতি ক্ষুদ্র বোধ হইবে। যেমন বৃহৎ অর্ণবপোতের নিকট সামান্য তরী অতি হীনরূপে প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ ব্যাস ও বাল্মীকি-চিত্রিত আয়ত আদর্শচরিতের নিকট সামান্য কবি-রচিত চিত্রের হীনতা। ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আধুনিক কবিগণ ব্যাস ও বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া সেই আদর্শ পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত ও সমলঙ্কৃত করিতেই চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র; তাঁহারা নূতন কোন সতীচরিত্রের সৃষ্টি করিতে যান নাই।

নারীশিক্ষা।

স্বভাবহস্তে মানবপ্রকৃতির পশুত্বেরই প্রাধান্য। এই পশুত্বের হ্রাস করাই শিক্ষার কার্য্য। যদ্দ্বারা পশুত্বের প্রাধান্য গিয়া

মনুষ্যত্ব এবং দেবত্বের প্রাধান্য হয়, শিক্ষা তাহাই দেখিবে। আর্য্যসমাজে সেই শিক্ষা পারিবারিক ও সামাজিক রীতি নীতি দ্বারা অধিকাংশই সম্পন্ন হয়। স্ত্রীজাতিকে স্বভাবহস্তে রাখিয়া দিলে, সেই স্ত্রীজাতির প্রকৃতি কত নিন্দনীয় হয়, তাহা আর্য্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সেই স্ত্রীজাতি শিক্ষাপ্রভাবে কেমন দেবপ্রতিম হইয়া উঠে, তাহাও আর্য্যসাহিত্যে সতীচরিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। মানবপ্রকৃতি স্বভাবহস্তে এত মলিন যে, আশৈশব সেই মলা পরিষ্কৃত করিলে তবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়। আর্য্যধামে এজন্য আশৈশব বালক বালিকাগণের শিক্ষাব্রত * অবলম্বিত হইত। পিতৃগৃহ হইতে গুরুগৃহে বালকগণের শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইত; পিতৃগৃহ হইতে বালিকাগণকে আশৈশব বিনীতা ও সুশীলতাসম্পন্না করিবার জন্য অতি তরুণ বয়সেই শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হইত। যে তরুণ কালে বালকগণ গুরুগৃহে যাইতেন, ততই তরুণ বয়সে বালিকাগণ শ্বশুরগৃহে যাইতেন। পিতৃগৃহে যাহার প্রারম্ভ, পরগৃহে তাহার পরিপুষ্টি ও সমাপ্তি। গুরু তরলমতি শিষ্যগণকে যেরূপ শাসনে রাখিয়া তাহাদিগকে মানুষ ও গুণবান করিতেন; শ্বশুরালয়ে বালিকার গুরুজনেরা তাহাকে সেইরূপ শাসনাধীন করিয়া ভবিষ্য সংসারের জন্য উপযোগিনী করিয়া দিতেন। পরগৃহে যে শাসন হয়, পিতামাতার গৃহে সেরূপ শাসন হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া আর্য্যধামের এই সামাজিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাক্রমে সেকালে বালক বালিকাগণ সুশিক্ষিত হইয়া সংসারকার্য্যে

---

* এই শিক্ষাব্রত শুধু গ্রন্থাধ্যয়ন নহে; মনুতে দৃষ্ট হইবে, তাহা অতি কঠিন শাসন প্রণালী।

সুদক্ষ এবং সুখী হইতে পারিত। যখন এই বালক বালিকাগণ প্রবৃদ্ধ হইয়া সংসারাশ্রমে অধিষ্ঠিত হইতেন, যখন তাহাদের আবার সন্তানসন্ততি হইত এবং সংসার-বৃক্ষ চারিদিকে নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হইত, তখন তাহাদের শিক্ষাফল ফলিত। তাহারা নিজে কিরূপ মানুষ হইয়া সন্তানসন্ততিগণকে মানুষ করিতেছেন, সংসারকার্য্যে কিরূপ পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিতেছেন, প্রেম ও স্নেহ মমতার ব্যবহারে কেমন সকলকে আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত করিতেছেন, তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইত। সংসারাশ্রম প্রবৃত্তির বিস্তৃত ক্ষেত্র। প্রবৃত্তির এই বিশাল ক্ষেত্রে যিনি সেই প্রবৃত্তির ঘোর তরঙ্গে গা ঢালিয়া দেন, তাঁহার সেই সংসার-তরঙ্গই বাড়িতে থাকে; আবহমান কাল ও জন্ম জন্মান্তর বাড়ে। প্রবৃত্তির স্রোতে তাঁহার আত্মা চিরকালই এক সংসার হইতে অন্য সংসারে ভাসিয়া যায়। জন্ম জন্মান্তর তাঁহার আত্মা এইরূপ সংসারাশ্রমে ঘুরিয়া বেড়ায়। সংসারের সুখ· দুঃখই তাঁহার সম্ভোগ্য ও প্রধান সম্পত্তি। সে সুখ যত কেন বাড়ুক না, তাহাতে দুঃখাংশই অধিকতর। সংসার 'পয়োমুখ বিষকুম্ভ'। এই জন্য আমাদের ঋষিগণ এই সংসারের নিবৃত্তিসাধন জন্য পন্থা দেখিয়াছিলেন। এই প্রবৃত্তি-স্রোতকে দমন করিতে পারিলেই সংসারের গতিরোধ হয়; সংসারের গতিরোধ হইলেই তজ্জনিত সুখ দুঃখেরও পরিমাণ কমিয়া যায়। এই সংসারের গতিরোধ কিরূপে হয়? যিনি সেই সংসার-স্রোতে ভাসিয়াছেন, তাঁহার সাধ্য কি সেই গতি রোধ করিতে পারেন? সেই স্রোতে না ভাসিতে হয়, এমত দণ্ড ও কর্ণের নিতান্ত আবশ্যকতা। যিনি শিক্ষাপ্রভাবে সেই দণ্ড ও কর্ণধার হইতে পারিয়াছেন,

তিনিই কেবল সে স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারেন, তিনিই কেবল যৌবনের উন্মত্ততাকে শাসন করিতে পারেন, রিপুকুলকে দমনে রাখিয়া সংসারধামে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। এই বল দিবার জন্য নারীশিক্ষাব্রত ও সতীত্বের সৃষ্টি, এবং গুরুগৃহে শিষ্যের শাসন ও বেদাধ্যয়ন এবং সংসারাশ্রমে নিবৃত্তিপথ-নিয়োজিত শম দম গুণের এত প্রয়োজন। বেদধ্যয়ন ও শাস্ত্রশিক্ষা শিক্ষাকার্য্যের কেবল সহায়তা মাত্র; মানবের সুচরিত্র সৃষ্টি করাই শিক্ষাকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

মৈত্রী।

নারীশিক্ষাব্রতের চূড়ান্ত ফল এই সতীর সৃষ্টি। আর্য্যধামে এতদপেক্ষা উচ্চতর নারীশিক্ষা আর কিছু ছিল না, আর কিছু হইবে না। অন্যবিধ নারীশিক্ষা বিধেয় হইলে, তাহা আমাদের মানবধর্ম্মশাস্ত্রে, গুরুগৃহে বালক-শিক্ষার ন্যায়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচিত হইত। মনু যেমন গুরুগৃহের শিক্ষাপ্রণালীর সমস্ত বিবরণ তন্ন তন্ন করিয়া দিয়া গিয়াছেন, নারীশিক্ষারও সেই প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া যাইতেন। অযোধ্যার গৃহধামে আমরা সীতাকে সতীত্ব-গৌরবে পরিপূর্ণ দেখি। কিন্তু সেই সীতা জনকালয়ে শৈশব হইতে কিরূপ শিক্ষাপ্রভাবে সেই সতীত্ব-গৌরব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা কোথাও দেখিতে পাই না। সেই শিক্ষা তিনি পিত্রালয়ে নিশ্চয় রাজর্ষির সাংসারিক ব্যবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সংসারধামে সুশীলা সতীর দৃষ্টান্ত নিশ্চয় দেখা যাইত, বার ব্রত এবং পাতিব্রত্যে সংযমের শিক্ষা হইত; বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভক্তিবৃত্তির উত্তেজন হইত।

এই ভক্তিতেই নারী পতিকে যথার্থ পক্ষে আপনার জীবিত-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। যিনি ভক্তিভাবে একনিষ্ঠ, নিঃস্বার্থ ও নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া পতিশুশ্রূষা করিতে পারেন, তিনি যে তদ্রূপ ভাবে দেবশুশ্রূষা করিবেন, এ বড় বিচিত্র নহে। আর যিনি আশৈশব গুরুজনকে এবং দেবদেবীকে ভক্তি করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম তত কঠিন নহে। যে ভক্তি পথের শিক্ষা এইরূপ অতি শৈশবকাল হইতে আরব্ধ হয়, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার পরিপুষ্টিসাধন হয়। অনুরাগ ও প্রেমের প্রসারণ এইরূপ ভাই ভগিনীতে আরব্ধ হইয়া উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। বেদজ্ঞানে যাহাদের অধিকার নাই, ভক্তিই তাহাদের প্রশস্ত পন্থা, প্রধান শিক্ষা ও তপস্যা। সতী অগ্রে জীবিত স্বামীকে পূজা করিতে শিখেন; কারণ, নিরক্ষরা নারীর নিকট জাজ্বল্যমান দেবতা অধিকতর ভক্তি-ভাজন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবিত দেবতা হইতে নারী দেবপ্রতিমাপূজায় নিরতা হয়েন। ভক্তিপথে স্থূল দেবপূজা ক্রমে সূক্ষ্মদেবপূজায় সমুত্থিত হয়। পার্থিব পতিপ্রেম সুবিস্তৃত হইয়া জগৎপতি-প্রেমে উত্থিত হয়। এই জগৎপতি-প্রেম যত পূর্ণতা লাভ করে, ততই তাহা সুপ্রসারিত হইয়া সমুদায় বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়ে। নারীর ক্ষমা, ও দান-ধর্ম্মে প্রেমের প্রশস্ততা হয়। অতিথিকে তিনি বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার সৎকারে নিয়োজিতা হন। বিষ্ণুর পূজার সহিত এই উদারতা আরও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে অনুরাগ অগ্রে কেবল পতিতে নিবদ্ধ ছিল, তাহা বিষ্ণুর সকল জীবেই বিস্তৃত হয়। সর্ব্বজীবে দয়া না করিলে বিষ্ণুর উপাসনা হয় না। সুতরাং সংসারের সঙ্কীর্ণ প্রেম বিশ্বসাগরে বিস্তৃত হয়। সতীর

প্রেম যখন এইরূপ প্রসারিত হইয়া সর্ব্বপ্রাণীতেই আইসে, তখন তাহার নাম বিশ্বব্যাপিনী মৈত্রী। পূর্ব্বকালে যিনি এই মৈত্রী লাভ করিতেন, তিনি পতির সহিত বনে গিয়া মুক্তি-পথে দাঁড়াইতেন। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নীর মধ্যে কেবল মৈত্রেয়ী এইরূপ উদার প্রেমপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাই সেই ঋষি তাঁহাকে আত্মজ্ঞানের অধিকারিণী বিবেচনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বস্তুতঃ স্বামীকে ভালবাস বলিয়া স্বামী তোমার প্রিয় নহেন, তুমি যে আত্মাকে ভালবাস, তজ্জন্যই স্বামী তোমার প্রিয়। বস্তুতঃ পুত্রগণকে ভালবাস বলিয়া, পুত্রগণ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে আত্মাকে ভালবাস, তজ্জন্যই পুত্রগণ তোমার প্রিয়। বস্তুতঃ ধনসম্পত্তি ভালবাস বলিয়া ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে আত্মাকে ভালবাস, তজ্জন্যই ধনসম্পত্তি তোমার প্রিয়।" গার্গীও এই মৈত্রীলাভ করিয়া আত্মজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছিলেন। যে আত্মজ্ঞান মুক্তি-পথের নিদান, পতি পূজার অবলম্ব ধরিয়া নারীকে একে একে দেবত্বে উঠিয়া সেই মুক্তি-পথে উপনীত হইতে হইত। তাই শাস্ত্রে পাতিব্রত্য-ধর্ম্মই নারীর মুক্তিপথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে;—সাক্ষাৎভাবে নহে, গৌণভাবে মুক্তির কারণ। সতী, পতির মধ্য দিয়া মুক্তিপথে উপনীত হন। এই দেবাদর্শ হারাইয়া আমরা এখন কেমন পতিত হইতেছি!

দেবাদর্শ।

আবহমান কাল দেবাদর্শ নারীর সম্মুখে বিস্তৃত। নারীর দেবাদর্শ লক্ষ্মী, সরস্বতী ও ভগবতী। ঐশ্বর্য্যশালিনী আর্য্যনারী লক্ষ্মীর ন্যায়

মৃদুতা, ধীরতা ও পতিভক্তি লাভে যত্নবতী হয়েন। বুদ্ধিমতী রমণী সরস্বতীর ন্যায় গুণবতী হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন। আর সকলেই ভগবতীরূপিণী হইবার প্রয়াস পান। আজিও আমরা পতিনিষ্ঠা, ধীর ও শান্তপ্রকৃতি সুশীলা নারীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, গুণবতীকে সাক্ষাৎ সরস্বতী, এবং সর্ব্বজনে দয়াবতীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপা জ্ঞান করিয়া থাকি। জ্ঞান করি কেন? এই সকল দেবাদর্শ উজ্জ্বলবর্ণে আমাদের অন্তরে অঙ্কিত আছে বলিয়া। মহাভারতে "সত্যভামা ও দ্রৌপদী-সম্বাদে" আমরা দেখিতে পাই, সত্যভামা দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবি! আমি একমাত্র স্বামীকে বশীভূত করিতে পারি না, তুমি পঞ্চস্বামীকে কোন্ শক্তিপ্রভাবে বা মন্ত্রবলে বশীভূত করিয়াছ? দ্রৌপদী সেই বশীকরণ মন্ত্রের যেরূপ পরিচয় দিলেন, তাহাতে সত্যভামা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। শুনিলেন, সেই মন্ত্রবল আর কিছু নয়, কেবল একান্তমনে স্বামিশুশ্রূষামাত্র। শুনিলেন, দ্রৌপদী রাজমহিষী হইয়াও নিজ হস্তে সমস্ত সংসার-কার্য্য করিতেছেন; একান্ত মনে পঞ্চস্বামীকে সমান অনুরাগে যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষোৎপাদন করিতেছেন। দ্রৌপদীর চক্ষে সেই পঞ্চস্বামী পঞ্চদেবতা হইয়াও এক; এক মহেশ্বর যেন পঞ্চানন। দ্রৌপদী নিজে গৃহধাম পরিষ্কৃত করিয়া ভক্তিসহকারে ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় নিরতা আছেন। স্বহস্তে সমুদায় তৈজসাদি মার্জ্জিত করিতেছেন, মহাযজ্ঞের পাককার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন, এবং সকলকে ভোজনপানাদি বিতরণ করিয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। এক দণ্ডের নিমিত্ত তাঁহার আলস্য নাই। অতিথিসৎকারে মহাযত্ন। সকলের পরিতোষার্থ একান্ত ব্যস্ত। একা

দ্রৌপদী সহস্ররূপিণী। তেজস্বিনী গৃহকার্য্যে অতি ধীরা, ব্যবহারে অতি নম্রা, সম্ভাষণে ও অভ্যর্থনায় অতি বিনয়িনী। পাকশালায় তিনি দময়ন্তী, অন্নদানে তিনি স্বয়ং অন্নপূর্ণা। একি দ্রৌপদী! না স্বয়ং লক্ষ্মী! ভগবতী দশহস্তে বিরাজিতা! সত্যভামা দ্রৌপদীর মন্ত্র ও ওষধিবল স্বচক্ষে দেখিয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

আদর্শ সতী।

আর্য্যসাহিত্য নারীর আদর্শ দিয়াছে, পতির আদর্শ কি কিছু দেয় নাই? পতির আদর্শও আর্য্যসাহিত্যে আছে। সতীর আদর্শ আর্য্যগণ কোথা হইতে লাভ করিয়াছিলেন? সে আদর্শ পাইয়াছিলেন, প্রথম সতীতে—যে সতী অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান—যে সতী পুরুষে নিত্য আসক্ত। দেবাদর্শই আর্য্যদিগের অনুকরণীয়;—বেদ তাহাদিগের নিকট সেই দেবাদর্শই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই দেবাদর্শই প্রকৃতি-সতী ভবানী। পুরুষ মানবের নিকট কেবল প্রেমময় সত্তায় উপলব্ধ; প্রেমই কেবল সর্ব্বসংসারকে সংযুক্ত করে; বিদ্বেষ ধ্বংস করে। সেই প্রেমময় সত্তা এই জগৎসংসার, বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি। পুরুষের প্রেমময়ী মূর্ত্তি সুতরাং প্রকৃতি। প্রকৃতি কত কাল? যতকাল পুরুষ—পুরুষ অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান; সেই অনাদিকাল হইতে পুরুষপ্রকৃতি পরস্পরাসক্ত; এক মুহূর্ত্ত তাহাদের বিচ্ছেদ নাই; কারণ, পুরুষের সত্তাতেই প্রকৃতির সত্তা। পুরুষের আশ্রিত এই বিশ্ব বলিয়া পুরুষ বিশ্বেশ্বর, প্রকৃতি বিশ্বেশ্বরী। বিশ্বেশ্বর প্রকৃতিতে অবস্থান করিয়া বিশ্ব গড়িতেছেন, রক্ষা করিতেছেন

এবং ধ্বংস করিতেছেন। বিশ্বেশ্বরের লীলাই এই; এই লীলা নহিলে পুরুষ প্রকৃতি থাকিতে পারেন না। এই লীলাই তাঁহাদের সংসার। মানবের নিকট এই সংসার মায়াময়; মহামায়া এই বিশ্ব-প্রকৃতি। মহামায়া চিরদিন পুরুষ-প্রেমাধীনা, সতী পুরুষের পদতলে। সেই পুরুষ, প্রকৃতির সর্ব্বস্বধন ও সর্ব্বাশ্রয়। তাঁহাকে লইয়াই সতীর সংসার, তাঁহার কার্য্যেই নিত্য নিয়োজিতা। পুরুষে তিনি নিত্যকাল স্থির; নিত্য কাল আসক্তা সতী। যাহা নিত্যকাল বর্ত্তমান, তাহা সৎ; যাহা আশ্রিতভাবে নিত্য বর্ত্তমান, তাহা সতী।

পতির আদর্শ।

এই সতীই আর্য্যদিগের আদর্শ সতী; আর তাঁহারই পতি আদর্শ পতি। সেই বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরীকে লইয়াই আমাদের পতিপত্নী গঠিত। সতী ও পতির যুগল আদর্শ হরপার্ব্বতী। হরের মত পতি আর্য্যকুমারীর স্বপ্ন, আশার স্বর্গসুখ এবং কল্পনার প্রতিমা। শিব যেমন ভবানীতে নিত্য আসক্ত, আর্য্যকুমারী নিজ পতিকে তেমনই প্রেমময় ও আসক্ত দেখিতে চাহেন। তাই তিনি অতি তরুণকালে শিবপূজার ব্রত লইয়া শিবের নিকট বর চাহেন,—আমি তোমার মত পতি যেন জন্ম জন্ম লাভ করি। এই কৌমারব্রত কালিদাস উমায় প্রদর্শন করিয়াছেন।

কুমারে আমরা উমাকে শিবারাধনায় নিযুক্তা দেখি। উমা সতীরূপে শিবকে পাইয়া বড়ই সুখিনী হইয়াছিলেন; আবার তিনি সেই মহাদেবকে পতিলাভের জন্য একান্ত মনে তপস্যা করিতে

লাগিলেন। * উমার তপস্যাব্রত কেমন সুন্দর ও মনোহর দৃশ্যে পরিশোভিত! কালিদাসের এই উমাসাধনা কাহার মনে না লাগিয়া রহিয়াছে! উমা মহেশ্বরকে কত তপস্যায় না তৃপ্ত করিতেছেন! কৈলাসে উমার শিবপূজার জন্য নিত্য পুষ্প বিকসিত হইতেছে! মহাদেব পূজাকালে উমার স্বর্ণথাল হইতে রাশি রাশি পুষ্প লইয়া কত তৃপ্তিলাভ করেন! তপস্যায় তুষ্ট করিয়া উমা সর্ব্বশেষে সেই মহাদেবকেই পতিরূপে লাভ করিয়াছেন।

প্রেমময়।

আর্য্যনারীরও এই তপস্যা, স্বপ্ন ও ব্রত। যিনি সতীর সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার জন্য উমার যেমন তপস্যা; তদ্রূপ সতীসৃষ্টিকারী পতির জন্য আর্য্যনারীর তপস্যা। যিনি প্রেমাধার, তিনিই সতীর সৃষ্টিকর্ত্তা; তিনি প্রেমে নারীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়া শত আদরে, শত সোহাগে তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিতে থাকেন। নারী সেই প্রেমসোহাগে ভুলিয়া থাকেন, একনিষ্ঠ হইয়া সেই প্রেমসর্ব্বস্বধনের অনুগামিনী হন। তত আদর, তত সোহাগে আর তাঁহাকে কে রাখিবে? আদর্শ পতি নিজ পত্নীকে প্রেমাদরে স্বর্গসুখে রাখেন; পত্নীর প্রেমময় দেবতা রূপে তাঁহার কল্পনা-চক্ষে দেখা দেন। সেই দেবানুগামিনী হইয়া পত্নী সতীর একনিষ্ঠতা লাভ করেন। তাঁহার পতির প্রেম যেমন নিরাকাঙ্ক্ষ, নিঃস্বার্থ, একনিষ্ঠ এবং পত্নী-গরিমায় পরিপূর্ণ;

* জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়—প্রকৃতির নিয়ম; তাই সতী জন্মান্তরে, উমারূপে উদিতা।

পত্নী সেই প্রেমাদর্শে নিজ প্রেম গড়িতে থাকেন, নিজ আসক্তি নিয়মিত করেন, এবং সতীরূপে কেবল পতিরই অনুরক্ত থাকেন। মনু এইরূপ পতিকে আদর্শ পতি বলিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ আদর্শপতি বশিষ্ঠ ও মন্দপাল। তাঁহারা অতি নিকৃষ্ট-কুলসম্ভবা অক্ষমালা এবং শারঙ্গীকেও পরম মান্যা রমণী-রত্ন রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মনু আরও বলেন, "সত্যবতী প্রভৃতি আর কতিপয় রমণী অপকৃষ্টযোনিজা হইলেও ভর্ত্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। ভার্য্যার সুরক্ষাবিধানে যিনি সবিশেষ যত্নবান হন, তিনি তদ্দ্বারা নিজ বংশপরম্পরা, আত্ম-চরিত্র এবং ধর্ম্ম—এ সমস্তই রক্ষা করেন।" তবেই দেখা যাই-তেছে, পত্নীর সুরক্ষাগুণে সতীর সৃষ্টি হইলে, কি বংশ, কি আত্ম-চরিত্র, কি ধর্ম্ম, সমস্তই সুরক্ষিত হয়। মহাদেব সতীর প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে এক দিনের তরেও ছাড়িয়া থাকিতেন না। দক্ষযজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণেও সতীর সঙ্গে সঙ্গে অনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

আশুতোষ।

শুধু কি এই অতুল্য প্রেম ও পত্নীরক্ষার জন্য মহাদেব আদর্শ-স্থানীয়। হর, রূপে গুণে আর্য্যকুমারীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া রহিয়া-ছেন। হরের মত রূপবান আর কে? যিনি প্রেমময়, তিনি সর্ব্বসুন্দর। রাধিকার চক্ষে কৃষ্ণবর্ণ কালা,—শ্যামসুন্দর মদন-মোহন। ভবানীর চক্ষে ভব ততই সুন্দর ও মনোহর, তিনি ততই সুন্দর বলিয়া কেবল কৈলাসধামেই শোভা পান। তিনি

সকল সৌন্দর্য্যের সার। রাধিকার যেমন হরি, ভবানীর যেমন ভব, আর্য্যকুমারী তেমনি প্রেমময় রূপবান পতি লাভ করিতে চাহেন। যে পতিকে দেখিলে জগৎ ভুলিয়া থাকে, সেইরূপ পতিলাভের জন্য আর্য্যনারী ব্রতচারিণী। যিনি সর্ব্বসুন্দর শিব, তাঁহারই রূপে ভবানী মুগ্ধা। প্রেমময়ের এত রূপ কিসে? ভবের গুণে। যিনি গুণে আশুতোষ, তাঁহার রূপ, গুণ কি একমুখে বলা যায়? আর্য্যনারী আশুতোষ পতি-আকাঙ্ক্ষিণী। পতির যত দোষ থাকুক না কেন, আশুতোষ পতি সর্ব্বগুণে গুণান্বিত। যিনি এক কথায় তুষ্ট, তাঁহার সহবাস স্বর্গসুখ। তিনি সদাই প্রফুল্ল ও প্রসন্ন। যিনি নিজে প্রফুল্ল, প্রফুল্লা তাঁহার স্ত্রী। সুতরাং সদাসুখ সেই পতি পত্নীর সংসারে বিরাজিত। অল্পেই যিনি পরিতুষ্ট, তাঁহার সেবা করিয়াও পরিতোষ জন্মে। এইরূপ আশুতোষ ভোলা মহেশ্বরের ন্যায় পতিলাভের নিমিত্ত আর্য্যনারীর চির আশা।

আনন্দময়।

যিনি অল্পে পরিতুষ্ট, তিনি সমস্ত দিন সংসারের কার্য্য করিয়া ঘরে আসিয়া দেখেন, গৃহিণী তাঁহার জন্য কত কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন; অমনি তাঁহার আর আহ্লাদ ধরে না। ভোলানাথ সর্ব্বদাই বিশ্বসংসারের ভাবনায় নিরত। ঘরে আসিয়া দেখেন, তাঁহার অন্নপূর্ণা গৃহ আলো করিয়া রাখিয়াছেন; সমস্ত গৃহবাস পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন; সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত; গৃহের যেখানে যে শোভা খাটে, সেইখানে সেই শোভা ও অলঙ্কার। সতী শত ঐশ্বর্য্যে সুন্দরী সাজিয়া তাঁহার প্রত্যুৎগমনে ব্যস্ত। আর

ভোলানাথকে পায় কে? তিনি আনন্দে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আনন্দময়ের বুঝি আনন্দের সীমা নাই। সদানন্দ শিব গৃহে আসিয়া দেখিলেন, গৃহ মধ্যে স্বয়ং শ্রী বসিয়া আছেন। যে পতি শিবের মত প্রেমময় ও সদানন্দ, তিনি আপনার স্ত্রীকে যথার্থই গৃহের শ্রীস্বরূপা দেখেন। যিনি আপনার স্ত্রীকে শ্রীস্বরূপা দেখিতে পারেন, তাঁহার গৃহে নারী পরিতুষ্ট থাকেন। নারীর পরিতোষ ও মান যে সংসারে, সেই সংসারেই সুখ, সেই সংসারের শ্রীবৃদ্ধি। মনুর মতে এইরূপ আনন্দময় পতিই আদর্শ পতি।

অব্যভিচারী।

মনু আরও বলিয়াছেন,—"মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রীপুরুষের পরমধর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোন মতে বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক।" আদর্শ পতি প্রেমময়, আশুতোষ, সদানন্দ, এবং নিজ পত্নীকে লক্ষ্মীরূপা জ্ঞান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি নিজে কথন ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া সেই লক্ষ্মীরূপার অসন্তোষ উৎপাদন করেন না। আর তিনি পত্নীকে আজীবন নিজ সংসারে রাখিয়া তাহাকে সাবধানে রক্ষা করেন। তিনি জানেন, "স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও সতত রক্ষণীয়া, কারণ, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা ঘটিলে সেই স্ত্রী পিতৃভর্ত্তৃ উভয় কুলেরই সন্তাপের কারণ হয়।" তাই পতি তাহাকে সর্ব্বদাই নিজ নিকটে রাখিয়া রক্ষা করিয়া থাকেন। যে সংসারে পতিপত্নী সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া সংসার-

কার্য্য সুনির্ব্বাহ করেন, সে সংসারে দম্পতী পরস্পরের শাসন; পতি যেমন পত্নীর শাসন, পত্নীও তেমনি পতির শাসন। সুতরাং সংসারে ব্যভিচার-দোষে কলঙ্কিত হইবার যো থাকে না। প্রেমময়ের অঙ্কে প্রেমময়ী সদাসুখে বিচরণ করেন, এবং প্রেমময়ীর সেবা ও যত্নে প্রেমময় পতি স্বর্গসুখে অবস্থান করেন।

মনু ব্যভিচার-দোষের ষড়্‌বিধ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—মদ্যপান, অসৎ পুরুষ-সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল-নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস। ব্যভিচারের এই সমস্ত কারণ যেমন স্ত্রীর প্রতি প্রযুক্ত হয়, পতির সম্বন্ধেও সঙ্গত। সুতরাং ব্যভিচার-নিবারণার্থ এই সমস্ত দোষ সংসারে না প্রবেশলাভ করে, তদ্বিষয়ে আদর্শপতি সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন। আদর্শপতি যেমন সংসারের ভাবনায় নিজে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তিনি পত্নীকেও সুরক্ষিতা করিবার জন্য এই সকল কার্য্যে তাহাকে দিবারাত্র নিযুক্তা রাখেন—অর্থের ব্যয়সাধন ও সংগ্রহ, নিজ শরীর ও গৃহ দ্রব্যাদির শুদ্ধি-বিধান, অন্নপাক, এবং গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণ। তাহা হইলেই উক্ত ষড়্‌বিধ দোষ অনায়াসে নিবারিত হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাশ্রয়।

একদিকে দোষের নিবারণ করা যেমন কর্ত্তব্য, অন্যদিকে ভার্য্যার প্রেম ও ভক্তির স্ফূর্ত্তিসাধন করা তদ্রূপ কর্ত্তব্য। সেই জন্য আদর্শ পতি সহধর্ম্মিণীকে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানেই সহকারিণী করিয়া লয়েন। প্রতিদিনের পঞ্চযজ্ঞে গৃহপতি সহধর্ম্মিণীর সহায়তা না লইলে, কখনই সম্পন্ন করিতে পারেন না। কেবল ব্রহ্মযজ্ঞ ব্যতীত

অপর চারি যজ্ঞে সহধর্ম্মিণীর সাক্ষাৎসম্বন্ধ; পিতৃ, দেব, ভূত এবং মনুষ্যযজ্ঞের সমস্ত আয়োজন সহধর্ম্মিণী করিয়া দেন। অতিথিসেবা ও অন্নদানে তাঁহার সহায়তা একান্ত আবশ্যক। তদ্দ্বারা কি শুদ্ধ পতির প্রবৃত্তি ও ভক্তির চরিতার্থতা সাধন হয়? সহধর্ম্মিণীরও ভক্তি এবং প্রেম প্রসারিত হইতে থাকে। হিন্দু-সংসার পরম ধর্ম্মক্ষেত্র; সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে শুধু পতি কেন, পত্নী কেন, সমস্ত পরিবারমণ্ডলী অবস্থিত। সেই ধর্ম্মক্ষেত্রে অবস্থিত পতি, পত্নী, পুত্র, ভগিনী, ভাগিনেয়, পিতা মাতা প্রভৃতি সকলই ধর্ম্মে বৃদ্ধ ও পরিণত হইতে থাকেন। যে সংসারে এই ধর্ম্মের প্রভাব নাই, সে সংসার হিন্দু সংসার নহে। হিন্দু সংসারে নিত্য, নৈমিত্তিক, মাসিক, বাৎসরিক প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদিত হইলে তবে ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম, ক্ষমা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিসমূহের স্ফূর্ত্তিসাধন হয়। যে পরিমাণে তাহা সম্পাদিত হয়, সেই পরিমাণে তাহাদের স্ফূর্ত্তি। হিন্দুসংসারে ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান নিরর্থক নহে। পতিপত্নীর প্রেম তদ্দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া ভগবানে সমুত্থিত হয়। পতির প্রেম-প্রবাহিণী, সহধর্ম্মিণীর প্রেম সঙ্গে ভগবৎ-প্রেমের বিশ্বসাগরে আসিয়া পড়ে। ভগীরথ গঙ্গাকে আনিয়া সাগরের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, তৎসঙ্গে যমুনারও জল মিলিত হয়। গঙ্গা যমুনার মিলিত স্রোত আসিয়া কপিল-আশ্রমে ঋষিপূত হইয়া সগরবংশ সমুদ্ধার করে। পতিপত্নীর প্রেম সংসার-ধামে এইরূপ ঋষিপূত হইয়া বিশ্বব্যাপী ভগবানে ব্যাপ্ত হইলে তবে তাহা সর্ব্বভূতে বিসারিত হয়। প্রেম তখন মৈত্রীতে আসিয়া পরিণত। যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ীর প্রেম এই-রূপ ভক্তিপথে উৎসারিত করিয়া দিয়া, তাহা মৈত্রীতে আনিয়া-

ছিলেন। সে প্রেম ঋষিপূত হইয়াছিল; যাজ্ঞবল্ক্য সংসারে একাকী ঋষিত্বলাভ করেন নাই, নিজ সহধর্ম্মিণীকেও তৎসঙ্গে ঋষিপূত করিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"বস্তুতঃ স্ত্রীকে ভালবাস বলিয়া স্ত্রী তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে আত্মাকে ভালবাস, তজ্জন্যই স্ত্রী তোমার প্রিয়।" এ কথা যিনি বলিতে পারেন, তিনিই যথার্থ আদর্শ পতি।

দেবসংসার।

হিন্দুর দেব দেবী সকলেই সংসারী—এই জগৎ সংসার লইয়া তাঁহাদের সংসার-ধর্ম্ম। একই ব্রহ্ম দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ঈশ্বর ও ঈশ্বরী হইয়াছেন—সেই নির্গুণ সগুণে পরিণত—সেই নির্লিপ্ত বিশ্ব-সংসারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাই ঋগ্বেদে কথিত হইয়াছে,—ত্রিপাদ বিরাট পুরুষ একপাদ দ্বারা জগতে লিপ্ত রহিয়াছেন। মহেশ্বর সংসারী, অথচ সন্ন্যাসী। ভগবতী সংসারিণী অথচ ত্রৈলোক্যতারিণী মহা প্রেমময়ী বৈষ্ণবী। সেই সংসার-তারিণী রূপে তিনি মহিষমর্দ্দিনী। মহিষমর্দ্দিনী কি? মহিষাসুর অর্দ্ধ মানুষ, অর্দ্ধ পশু; ভগবতী মানবের সেই পশুত্ব-সংহারিণী। দেববল পশুবলের সংহারক। পশুবলের নিকট ভগবতী অপরা-জিতা। সেই অপরাজিতা, জগৎরক্ষিণী, বৈষ্ণবী শক্তি এই সংসারের পাপবিনাশকারিণী। এই সংসার-ব্যাপারে শিবপ্রেরিতা ভগবতী নিযুক্তা; মহাশক্তিরূপিণী হইয়া তিনি অবতীর্ণা। তাই সপ্তশতী চণ্ডীতে আছে:—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

সেই শক্তিনিহিত মহাদেব নির্লিপ্ত সংসারী। তাঁহার সংসার

নিষ্কাম পবিত্র ক্ষেত্র। এই বিশ্বপতিই হিন্দুর আদর্শপতি। হিন্দুর আদর্শপতিকে সংসারী হইয়া দেবত্বে উঠা চাই।

গুরু-জনসেবা।

দেবত্বে পতি কিরূপে উঠেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুর সংসার মহা ধর্ম্মক্ষেত্র; এই ধর্ম্মক্ষেত্রই দেবত্বলাভের প্রশস্ত ভূমি। এই হিন্দু সংসারে পতিপত্নী একাকী নহেন; তাঁহারা চারি দিকেই আত্মীয়, স্বজন, কুটুম্ব ও গুরুজনে পরিবৃত। প্রতিবাসী, অতিথি, পশু, পক্ষী, কীট, সকলেই এই সংসারভুক্ত। এ বড় প্রকাণ্ড সংসার। এ ইউরোপীয়গণের শুদ্ধ পতিপত্নীর সংসার নহে। হিন্দুসংসারাশ্রিত যত জন, সকলেই গৃহপতির অনুরাগ-ভাজন ও প্রেমপাত্র। তাঁহার প্রেমের আকাঙ্ক্ষী হইয়া সকলেই রহিয়াছেন; তাঁহাকে সেই প্রেম তিল তিল বণ্টন করিয়া দিতে হইবে; কেহ বঞ্চিত না হয়েন। তিনি শুদ্ধ নিজ পুত্রকলত্র লইয়া কেবল স্নেহ মমতার চরিতার্থতা সাধন করিতে পারিবেন না। শুদ্ধ পুত্র কলত্রকে কে না ভরণ-পোষণ করে? পশুতেও করে। হিন্দুগৃহপতি মহা সন্ধিস্থলে আসিয়া উপনীত। এক দিকে পুত্রকলত্রগণ মহা স্নেহ-বন্ধনে তাঁহাকে বিষম জোরে টানিতেছে, অন্য দিকে বৃদ্ধ পিতা, মাতা ও গুরু তাঁহার সমক্ষে বর্ত্তমান। শুদ্ধ পুত্র কলত্রে মুগ্ধ হইয়া, পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলন করা মহা পশুত্ব। হিন্দুর চক্ষে তাহা মহা ঘৃণার বিষয়। স্নেহ নীচগামী, ভক্তি ঊর্দ্ধগামিনী। মিল্টন বলিয়াছিলেন, মানবের পক্ষে উপরে উঠা যত কঠিন, নীচে নামা ততই সহজ। হিন্দুগৃহপতিকে

সেই উপর দিকে তাকাইতে হইবে। এ ইউরোপীয় জনসমাজ নহে,—সেখানে গুরু কেবল চর্চ্চে বর্ত্তমান; পিতা মাতা তত নিকটবর্ত্তী নহেন; তাঁহারা হয় ত পুত্রের সংসারে মূলেই নাই, তাঁহাদের স্বতন্ত্র সংসার; কিম্বা পিতা হয় ত বর্ত্তমান নাই; মাতা অন্য পতির আশ্রয়ে গিয়াছেন; গৃহপতি নির্ব্বিঘ্নে নিজ পুত্র কলত্র লইয়া শুদ্ধ স্নেহ মমতার সার্থকতা সাধন করিতেছেন। যে সন্ধিস্থলে হিন্দু গৃহপতিকে সচরাচর অবস্থিত হইতে হয়, ইউরোপীয় গৃহপতি সচরাচর সেরূপ অবস্থিত নহেন। তিনি স্নেহ-ডোরে আবদ্ধ থাকিবেন, কি ভক্তির উন্মেষ সাধন করিবেন? পশুত্বের সংহার করিয়া তাঁহাকে দেবত্বে উঠিতে হইবে। হিন্দুর গৃহস্থাশ্রম বড়ই কঠিন স্থান। শুদ্ধ ইহকালের সুখসম্ভোগার্থ গৃহ-পতির সংসার-ধর্ম্ম নহে; পরকালের অক্ষয় স্বর্গকামনা করিয়া তাঁহাকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হয়। এখানে মহা সংযমের আবশ্যকতা। দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইলে এই পবিত্র আশ্রম-নিয়ম প্রতিপালন করা যায় না। স্ত্রী যদি পতিকে, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা এবং কৌটিল্যে উত্তেজিত করেন, তাহার দমন করিতে হইবে। দমন করিয়া পিতামাতা ও আচার্য্য-গুরুর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা মহা তপস্যা লাভ করিতে হইবে। ভগবান্ মনু বলেন, "যত-দিন এই তিন জন জীবিত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র ভাবে কোন ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। প্রতিদিন ইঁহাদের প্রিয় কার্য্যসাধন ও সেবাশুশ্রূষা করিলেই হইবে। ইঁহাদের সেবাদির অবিরোধে পরলোককামনায় মনোবাক্ কর্ম্ম দ্বারা যে কিছু ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদায় ইঁহাদিগকে নিবেদন করিবে। তিন জনকে এইরূপ শুশ্রূষা করিলে পুরুষের ইতি-

কর্ত্তব্যতা শেষ হয়। ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম—তদ্ভিন্ন অগ্নি-হোত্রাদি যাগযজ্ঞ সকলই উপধর্ম্ম বলা যায়।”

এই কঠিন তপস্যা করিয়া হিন্দুপতিকে দেবত্বে উঠিতে হয়। পত্নী তাঁহাকে সেই দেবত্বে উঠিতে সহায়তা করিবেন। পত্নীর পক্ষে এ বড় কঠিন শাসন ও তপস্যা। নিজের ও পুত্রগণের প্রতি মোহ অতিক্রম করিতে তাঁহাকেই সহায়তা করিতে হইবে। স্বার্থপরতার এইখানে বিসর্জ্জন ও বলি—ভক্তির নিকট স্নেহের বলি—দেবতার নিকট সংসারাসক্তির বলি। এইরূপ বলি দিয়া পতিপত্নীকে গুরুজন-সেবায় নিয়োজিত হইলে প্রেম পরার্থপর হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। আশৈশব তাহাদের ভক্তির উন্মেষ হইতেছে; সেই ভক্তিকে অনায়াসে তৎপরে দেব-সেবায় নিয়োজিত করা যায়। ভক্তিকে শুধু দেবসেবায় নিয়োজিত নহে, সমুদায় প্রাণ মন দেবতায় নিবেদন করা চাই; ভগবানের একান্ত অনুরাগী হইয়া জ্ঞান করা চাই—এ সংসারের একমাত্র পতি কেবল তিনি; আমি কেবল তাঁহার নিমিত্ত মাত্র। যত দিন এই জ্ঞান সম্পূর্ণ না হয়, ততদিন কিছুই হয় নাই, নিজ অহঙ্কার ও গর্ব্ব সকলই বর্ত্তমান।

এই পরার্থপর প্রেম এবং গুরুজন-সেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রামচন্দ্র, ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির। পিতৃসন্তোষার্থ রামচন্দ্র রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া যেমন বনবাসে গিয়াছিলেন, ভীষ্ম তেমনি চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই পিতৃসেবার কি মহান্ দৃষ্টান্ত যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় প্রদর্শন করিয়াছেন! যে কুরু-কুল হইতে কুরুক্ষেত্রের মহা সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া সকলই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই কুরুপতি বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী

যুদ্ধের পরও জীবিত রহিলেন। তখন তাঁহাদের রক্ষাভার পড়িল পাণ্ডবগণের উপর। যুধিষ্ঠির কেমন একান্ত অনুরাগের সহিত সেই গুরুজন-সেবায় অনুরক্ত হইলেন, মহাভারতে তাহার বিরাট চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। এই মহাব্রতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা ও শিক্ষার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। তেমন উদার পিতৃসেবার চিত্র কি ইউরোপীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়?

দানধর্ম্ম।

প্রেম গুরুজন-সেবায় যেমন নিয়োজিত, তেমনি দানধর্ম্মে প্রসারিত। আর্য্যসাহিত্যে এই দানমাহাত্ম্য প্রকাশিত। নানাবিধ দানে গৃহীর প্রশস্ত হৃদয় ক্রমশঃই উদারতা লাভ করে। অতিথি-সেবায় গৃহী পুণ্যবান হন। যুধিষ্ঠিরের উদার মন এই দান-মাহাত্ম্য শুনিবার জন্য সর্ব্বদা উৎসুক হইত; তিনি অনেকবার ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে সেই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন, এবং সেই মাহাত্ম্য শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছেন। এরূপ আনন্দ কাহার মনে উদয় হয়? দাতা নহিলে দানমাহাত্ম্য শুনিয়া আনন্দলাভ করে না; দানমাহাত্ম্য শুনিবার নিমিত্ত তত পিপাসু হয় না। সেই যুধিষ্ঠির বলিয়া গিয়াছেন, প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান। দানের এরূপ উদার লক্ষণ কোন্ নীতিশাস্ত্রে আছে? প্রাচীন আর্য্যগণের সংসার এইরূপ বিশ্ব-বিসারী পবিত্র দানক্ষেত্র ছিল। সেই দান-ক্ষেত্রের কত পুণ্যছবি আমাদের আর্য্য-সাহিত্যের পবিত্রতা সাধন করিয়াছে; অতিথি-সেবার কত উদার অনুষ্ঠান আর্য্যসাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে!

ক্ষমা।

পূর্ব্বকালের সংসারের ধর্ম্মক্ষেত্রে পঞ্চযজ্ঞসাধন দ্বারা গৃহপতি প্রেম-প্রবৃত্তির প্রসারণ করিয়া ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমে কেমন উপনীত হইতেন, তাহা বোধ হয় এক্ষণে অনেক দূর প্রতীত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দুসংসার ন্যূনাধিক পরিমাণে এখনও হিন্দু সমাজে বর্ত্তমান। তাহা যে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, এমত কথা কেহ বলিতে পারিবেন না। প্রাচীন হিন্দুসংসারের যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে মূল সংসার-নিয়ম কিছু ভাঙ্গে নাই। সেই দারাপুত্র, কুটুম্ব সাক্ষাৎ, অতিথি সজ্জন, দাসদাসী, প্রতিবাসী সুহৃৎ, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, সমস্তই আজিও হিন্দুসংসার-ভুক্ত। সকলেই হিন্দুর প্রেমাভিলাষী। সম্পূর্ণরূপে না হউক, আংশিকরূপে তাঁহাকে সংসার-যজ্ঞ প্রতিদিন সম্পন্ন করিতে হয়। এই সংসার-যজ্ঞসম্পাদনে তাঁহাকে যেরূপ শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা ও প্রেমের অনুশীলন করিতে হয়, তাহাতে ক্ষমা তাঁহার আপনা-আপনি অভ্যস্ত হইয়া আইসে। কারণ, ক্ষমাশীলতা নহিলে হিন্দুসংসার চলে না। এই সংসার-ক্ষেত্রে সকলেরই আদর। এই আদর হেতু সংসারমধ্যে অনেকের অনেক সময়ে অনেক বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি ঘটিয়া থাকে। গৃহপতিকে সেই সমস্ত বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি সহ্য করিয়া ক্ষমা করিয়া যাইতে হয়। ক্ষমা না করিলে দারা, সুত, কুটুম্ব সাক্ষাৎ, পিতা, মাতা, গুরু পুরোহিত, অতিথি, সজ্জন, পশু পক্ষী, কাহারই আদর হয় না। আদর নহিলে কেহ প্রেমে আবদ্ধ থাকে না। আদর নহিলে নিজের প্রেম-প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি সাধন হয় না। সেই আদরে প্রেম-

ভাজনের দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুগৃহপতির প্রেম, শ্রদ্ধা, দয়া ও ভক্তি তাহাকে পক্ষপাতী করিয়া তুলে। তিনি পক্ষপাতী হন—জগতের প্রতি, বিশ্বসংসারের প্রতি, বিশ্বব্যাপী ভগবানের প্রতি। হিন্দুসংসারের মত ক্ষমারাজ্য আর নাই।

সেই ক্ষমা দেখ রামচন্দ্রে। কৈকেয়ী তাঁহার কি অনর্থই না করিয়াছিলেন? কৈকেয়ী যে শুদ্ধ রামের বনবাসের কারণ, এমত নহে; কৈকেয়ী তাঁহার একপ্রকার পিতৃহন্তা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রামবনবাসে দশরথ সেই যে হরিষে-বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, আর উঠিলেন না। অকালমৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল। তবে আর কৈকেয়ী কি না করিলেন? কিন্তু ক্ষমাশীল রামচন্দ্র নীরবে সকল বহন করিয়া কৈকেয়ীর অপ-রাধ কিছুমাত্র গ্রহণ করেন নাই। ক্ষমাগুণে রামচন্দ্র সদাকাল শান্তিরসে ভাসিয়াছিলেন। তিনি কখন অভক্তি সহকারে একদিনও কৈকেয়ীর প্রতি কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই। বনবাস-কালে লক্ষ্মণ তাঁহাকে কৈকেয়ীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলে তিনি লক্ষ্মণকেই ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। রামের এই শান্তস্বভাব চির-কালই অবিচলিত ছিল। এমন অক্রোধ ও ক্ষমা কি কেহ কখন দেখিয়াছে? তেমনই ক্ষমা বুঝি যুধিষ্ঠিরে। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রস্নেহে অন্ধ হইয়া পিতৃহীন পাণ্ডবগণের প্রতি যতদূর নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে হয়, তাহা করিয়াছিলেন? ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ব্যবহার দেখিলে আশ্চর্য্যজ্ঞান হয়। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে দেবসেবা করিয়াছিলেন। মহারাজ শান্তনু অতি ধীরপ্রকৃতি, সত্যবাদী, দানশীল এবং ক্ষমাবান বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। শিশুপালের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমা

মহাভারত-পাঠকমাত্রেরই বিদিত আছে। হিন্দুসংসারিণীও কত-দূর ক্ষমাগুণে ভূষিতা, পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা যখন ধৃত হইয়া দ্রৌপদীর সমক্ষে আনীত হইয়াছিলেন, তখন তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে; এ চিত্র আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। রাজা সৌদাস যখন দ্বিজবর বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সেই সৌদাস-ভার্য্যা ক্ষমাগুণে উত্তেজিতা হইয়া তাঁহাকে কেমন নিবারণ করিয়াছিলেন, বাল্মীকি তাহা শত্রুঘ্নকে বর্ণন করিয়াছেন।

আর্য্যসমাজে ক্ষমা অতিমানুষ ধর্ম্ম নহে; তাহা মানুষ ধর্ম্মেরই একাঙ্গমাত্র। এই দেখুন, ভগবান মনু কি বলিতেছেন :—

"ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম (বিষয়সংসর্গে মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায় পূর্ব্বক পরস্বাপহরণ না করা), শৌচ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (সংশয়াদি নিরাকরণ পূর্ব্বক সম্যক্ জ্ঞানলাভ), বিদ্যা (আত্ম-জ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। এই ধর্ম্মলক্ষণ সমুদায় দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, এবং যিনি তাহা অনুষ্ঠান করেন, তিনিই পরমাগতি প্রাপ্ত হয়েন।" *

প্রাচীন কালে দ্বিজাতিগণ এইরূপ ধর্ম্মলক্ষণে ভূষিত হই-তেন। আজিও যেখানে হিন্দুসংসার অক্ষুণ্ণ আছে, সেখানে ক্ষমাগুণই তাহার প্রকৃত বন্ধন। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজের গঠন ও শিক্ষা-প্রণালী স্বতন্ত্র। সেই জন্য সেখানে ক্ষমাগুণ বড়ই দুর্ল্লভ। আশ্চর্য্য এই, সেখানকার নীতিশাস্ত্রও ক্ষমাকে লোক-

* মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, ৯২।৯৩ শ্লোক।

ধর্ম্ম মধ্যে গণনা করিতে চাহে না। এই দেখুন, সেই নীতি কি বলিতেছেন :—

"To err is human, to forgive is divine."

ভগবান মনু যে ক্ষমাকে দশবিধ মানবধর্ম্ম মধ্যে গণনীয় করিয়াছেন, বিলাতী নীতিতে তাহা মনুষ্যের স্বধর্ম্ম নহে, তাহা দেবধর্ম্ম। স্বয়ং ঈশ্বরাবতার যীশু কেবল মৃত্যুকালে বলিতে পারিয়াছিলেন—পিতঃ, আমার এই হত্যাকারিগণকে ক্ষমা করুন; কারণ, তাহারা যে কি করিতেছে, তাহা জানে না। *

এই জন্য বিলাতী সাহিত্যে ক্ষমাগুণভূষিত লোক-চরিত্র অতি বিরল। সেক্সপিয়ার পোর্সিয়া এবং ইস্বাবেলার মুখে দেবোপম ক্ষমার গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সে বর্ণনা কেবল চিত্তকে ক্ষণিকের নিমিত্ত মুগ্ধ করে, তাহা কল্পনাকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। কল্পনাকে আকৃষ্ট করিতে হইলে, ক্ষমাকে লোক-চরিত্রে চিত্রিত করিয়া দেখান চাই। ধনলোভী শাইলকের চরিত্রে যেমন সুদখোরের গণনা, নির্দ্দয়তা, বিচারপ্রিয়তা এবং অমর্ষণ চিত্রিত হইয়াছে, এঞ্জিলোর চরিত্রে যেমন দণ্ডনীতির কঠোর নিয়ম-পালন অঙ্কিত হইয়াছে, সেইরূপ লোকচরিত্রে কি সেক্সপিয়ার ক্ষমা-গুণকে দেখাইয়াছেন? শাইলকের ভয়ানক অমর্ষণ ও নির্দ্দয়তার চিত্রাঙ্কণ সময়ে পোর্সিয়ার বক্তৃতা অতি মিষ্ট লাগে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণিক মাত্র; তৎপরে সে রস আর থাকে না। পাঠকের

* যীশু যে এ কথা বলিয়াছিলেন, রিণান প্রভৃতি সমালোচকগণ তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, যে কল্পনা এইরূপ ক্ষমা যীশুতে আরোপ করিয়াছে, সেই কল্পনা নিশ্চয় ক্ষমাশীলা।

প্রথম আবেগ থামিলে যখন তিনি স্থির চিত্তে সমুদয় বিচার করিয়া দেখেন, তখন তিনি ভাবিতে থাকেন, সেক্সপিয়ার আজি ঘৃণার্হ ইহুদীকে আরও ঘৃণার্হ করিবার জন্য একজন খৃষ্টানের মুখে ক্ষমার কথা শুনাইতে আসিয়াছেন; কিন্তু সেই ক্ষমা কি খৃষ্টানগণ কখন ইহুদী জাতিকে বিতরণ করিতে পারিয়াছিলেন? যদি পারিয়া থাকেন, তবে শাইলকের এত ক্রোধ কিসের? শাইলক ত টাকা আদায় করিতে আসেন নাই; খৃষ্টানজাতির পীড়ন ও অত্যাচারে ইহুদীজাতির জাতক্রোধের তিনি প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের পক্ষ যেমন পোর্সিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন, কই, নাটক মধ্যে ইহুদীগণের পক্ষ ত কোন উকিল সমর্থন করিতে দণ্ডায়মান হয়েন নাই। এই নাটক যদি একজন ইহুদী কবি লিখিতেন, তাহা হইলে তাহার ঘটনাচক্র ও রস সমস্তই অন্যবিধ হইত। "ভেনিসের বণিক" মনুষ্যলিখিত সিংহের চিত্র; খৃষ্ট কবির লিখিত ঘৃণার্হ ইহুদীর চিত্র। শাইলকের বিচার খৃষ্টান-গণের আদালতে। সুতরাং এ চিত্রে পক্ষপাতিতা ও একদেশ-দর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয়। খৃষ্টানেরা যেমন ইহুদীর বিপক্ষে দল-বদ্ধ হইয়াছিল, শাইলকের পক্ষে ইহুদীরা যে তেমনি দলবদ্ধ হয় নাই, এমত সম্ভাবিত নহে। কই নাটক মধ্যে সেই ইহুদীদলের চিত্র কই? দলবদ্ধ ইহুদীরা কি শাইলককে এক জন উকিল দিতে পরামর্শ দেন নাই? নাটকমধ্যে সেইরূপ একজন উকিল কি শাইলকের পক্ষে দেওয়া উচিত ছিল না? সেই উকিল পোর্সিয়ার মুখে মিষ্ট দয়ার কথা শুনিয়া কি বলিতেন? তিনি কি বলিতেন না?—"তোমরা খৃষ্টানদল, তোমরা ত ঘোর ঘৃণার সহিত নৃশংস মূর্ত্তিতে চিরদিন ইহুদীগণকে পীড়ন করিতেই প্রবৃত্ত। দেখ দেখি

একদিনের তরে সেই পীড়ন ফিরিয়া দিলে কেমন লাগে ? বার মাসের কথা দূরে থাক। বার মাস এণ্টোনিও শাইলককে ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া আসিয়াছেন ; আজিও দিতেছেন। সকল ইহুদীর প্রতিই খৃষ্টানগণের ঘৃণা। তাই খৃষ্টসমাজে ইহুদীজাতির প্রতি পীড়ন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তবে, খৃষ্টান উকিল মহাশয়, মিষ্ট মিষ্ট দয়ার কথা বলিতে আসিতেছ কেন ? খৃষ্টানেরা কি কখন সেই দয়া ইহুদীর প্রতি প্রদর্শন করিয়াছে ? তবে ইহুদীর কাছে কেন দয়া প্রত্যাশা কর ? আমাদের জাতিমধ্যে কি দয়া নাই ? তোমাদের দয়ার ব্যবহার আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি ; সেই দয়ার কথা তোমাদের মুখে শুনিলে আমাদের কি রকম লাগে ?" বাস্তবিক, শাইলকের ভয়ানক অমর্ষণ-চিত্রে আমরা কি এণ্টো-নিওর ঘৃণা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই না ? শাইলক কিসের ফল ? শাইলক কি খৃষ্টসমাজের পীড়ন-ফল নহে ? যে খৃষ্টানগণ ইহুদীগণকে তত নিপীড়ন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের মুখে দয়ার কথা ইহুদীর কাণে কেমন শুনায় ? খৃষ্ট কবির কল্পনায়, নাটক মধ্যে এণ্টোনিও ত বধ্য হয় নাই, শেষে শাইলকই বধ্য হইয়া দাঁড়াইল ; তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি করিয়া শেষে ডিউক দয়া করিয়া তাহার বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করিতে আজ্ঞা দিলেন। ইহুদী, খৃষ্ট আদালতে আসিয়া বিলক্ষণ দয়ার ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন ! কোথাকার জল কোথায় আসিয়া মরিল !

তবেই প্রতীত হইতেছে যে, পোর্সিয়ার মুখে ক্ষমার কথা উল্লেখ থাকিলেও সে কথা তিন কারণে ভাসিয়া যাইতেছে। (১) ক্ষমার কোন চিত্র অঙ্কিত না হওয়াতে, তাহা কল্পনায় স্থান পায় না ; (২) প্রসঙ্গক্রমে শাইলকের পক্ষে মনে যে-সকল

কথার উদয় হয়, তজ্জন্য পোর্সিয়ার মুখে ক্ষমার কথা শোভা পায় না; (৩) বিচারের শেষে শাইলকের প্রতি খৃষ্টানদিগের নির্দ্দয় ব্যবহার। বাস্তবিক, ক্ষমাকে প্রবল করাও কাব্যকল্পনার উদ্দেশ্য নহে। মানুষ কেমন আপনার জালে আপনি পড়ে, তাহাই প্রদর্শন করা, বোধ হয়, কাব্যকল্পনার উদ্দেশ্য। আমরা বলি, সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধই হইয়াছে।

অক্রোধ ও অহিংসা।

ক্রোধের সংযম নহিলে ক্ষমার সঞ্চার হয় না। স্নেহ মমতা ও প্রেমের প্রসারণে ক্রোধের সম্বরণ অনায়াস-লব্ধ হয়। প্রেম, ক্রোধের মহৌষধি? প্রেম ও স্নেহবারিসিঞ্চনে ক্রোধাগ্নি আপনা-আপনি নির্ব্বাপিত হয়। সুতরাং হিন্দুসংসার অক্রোধ অভ্যাস করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র; এই ঋষি-প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র দেবত্বে উঠিবার প্রধান অবলম্বন। দেবত্ব লাভ কিসে হয়, মহাভারত তাহা বলিতেছেন:—

"তত্র বৈ মানুষাল্লোকাদ্দানাদিভিরতন্দ্রিতঃ।
অহিংসার্থসমাযুক্তৈঃ কারণৈঃ স্বর্গমশ্নুতে॥"—বনপর্ব্ব।

"নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদি কর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলোক লাভ হয়।"

তবেই দেখা যাইতেছে, গৃহী নিরালস্য হইয়া দানাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে অক্রোধ ও ক্ষমাগুণে ভূষিত হইলে তবে তাঁহার হৃদয়ে অহিংসার সঞ্চার হইতে থাকে। অহিংসার নিমিত্ত যিনি একান্ত যত্নবান থাকেন, তাঁহারই হিংসাদোষ ক্রমে ক্রমে

অপনীত হয়। প্রেমের সামান্য প্রসারণে অহিংসার উদয় হয় না। পরসুখে প্রেম সুখী; হিংসা কেবল নিজ সুখ চাহে। পরার্থপর প্রেম যত প্রগাঢ় হইতে থাকে, স্বার্থপর হিংসার তত সম্বরণ হয়। এই প্রেম বিশ্বব্যাপী হইলে যখন একে একে সমদর্শিতা জন্মে, তখন আর হিংসাজনিত ভয়ে ভীত হইতে হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য সংসার-ক্ষেত্রে যখন এই প্রকার সমদর্শিতায় উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তিনি মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"বস্তুতঃ জগৎকে ভালবাস বলিয়া জগৎ তোমার প্রিয় নহে, তুমি যে আত্মাকে ভালবাস, তজ্জন্যই জগৎ তোমার প্রিয়।"

এইরূপ বলিয়া তিনি সংসারাশ্রম হইতে বিদায় লইয়া বনবাসে প্রস্থান করিলেন। কারণ, তখন স্বর্গ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, এবং নরলোক হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন; তখন তিনি ব্রহ্মলোকদর্শনার্থ সন্ন্যাসাবলম্বন করিলেন।

আর্য্যসাহিত্যে অহিংসার গৌরব শতমুখে ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে এই পরমধর্ম্ম দেদীপ্যমান। ভীষ্ম, বিদুর প্রভৃতি হিংসাবিরত ছিলেন। শুক ও নারদাদি ঋষি-চরিত্রেও এই অহিংসার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। বাস্তবিক, অহিংসাই হিন্দুর প্রধান ধর্ম্ম। এই অহিংসা হিন্দু-প্রকৃতিকে ক্রমে মৃদু হইতে মৃদুতর ও বিনম্র করিয়া আনে; হিন্দুকে ক্ষমাশীল করিয়া শান্তিনিকেতনে লইয়া যায়। বুদ্ধদেব এই শান্তিময় অহিংসার অবতার; হিন্দুধর্ম্ম তাঁহাকে অহিংসা শিক্ষা দিয়াছিল। বৌদ্ধ ও জৈনেরা আর্য্যধর্ম্মের এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া শান্তিপথ স্থাপন করিয়াছেন। কেবল খৃষ্টসমাজে এই অহিংসাধর্ম্মের তত আদর দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য বিলাতী সাহিত্যে অহিংসার চিত্র অত্যন্ত বিরল।

সেই সাহিত্যে ন্যায়পরতার (Justice) উগ্রমূর্ত্তি যত জাজ্বল্যমান, ক্ষমার প্রশস্ত মূর্ত্তি তত নহে। অহিংসার ছবি তাহাতে একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর্য্য সাহিত্যেও দণ্ডনীতির ভয়ানক চিত্র সকল সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ধর্ম্মক্রোধ হেতু পাপের প্রতি অভিসম্পাত এবং অপরাপর গুরুদণ্ডবিধানের চিত্র কোথায় না আছে? কিন্তু তৎপার্শ্বে ক্ষমা ও প্রেমের বিরাট চিত্রাদির পুণ্যজ্যোতিঃতে সেই সাহিত্য আলোকিত হইয়াছে।

স্বর্গ।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, ক্ষমা, অক্রোধ ও অহিংসার দেবাদর্শে আর্য্য-সাহিত্য পরিপূর্ণ। সমুদায় দেবতাদিগের বাস স্বর্গে; স্বর্গধাম অতি সুখের আলয়। আর্য্যসাহিত্যে প্রতীত, অতি কঠিন, বন্ধুর পার্ব্বত্যদেশ দিয়া সেই স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে উঠিতে হয়। ঊর্দ্ধদেশে এই জন্য যে, প্রবৃত্তি, শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধগামিনী হইলে, তবে দেবত্বে উঠা যায়। সংসারী আর্য্যগণ সেই স্বর্গের ঊর্দ্ধদেশ দিকেই তাকাইয়া থাকিতেন। স্নেহ মমতার নিম্নভূমিতে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ঊর্দ্ধদিকে গুরুজনের প্রতি ভক্তিসহকারে চাহিয়া থাকিতেন। দেবতাগণ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। আর্য্যকবিগণ দেবতা সকলকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। লক্ষ্মী মাধুরীময়ী স্বর্ণপ্রতিমা। বেদমাতা সরস্বতী পবিত্রতাময়ী শ্বেতবর্ণা মোহিনী মূর্ত্তি। ভগবতী সর্ব্বাসুরবিজয়িনী দশভুজা শক্তিরূপিণী। আদিত্য জগৎ প্রসবিতৃত্বের দেবতা; জগতের সর্ব্বাবরক বরুণদেব; অগ্নি সর্ব্বতেজের আধারভূত; বায়ু

জগতের জীবন। এক বিষ্ণু সমস্ত রূপেই বর্ত্তমান। এক অনন্ত-দেব অনন্তবিভূতিতে স্বর্গধামে বিরাজিত। তাঁহার অনন্তবিভূতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিকাশ না দেখিলে কি সেই অনন্তদেবকে ধারণা করা যায়? স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভূতির বিকাশেই সেই অনন্তদেব, ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন। মনুষ্যচক্ষে তিনি বিশ্বরূপে দেদীপ্যমান। সামান্য জ্ঞানচক্ষে মানব একেবারে সেই অনন্তদেবকে ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু তাঁহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভূতির অনন্তমূর্ত্তি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অনন্তরূপে দেখিতে পায়। জগতের সেই অনন্ত বিভূতিময়রূপ, আর্য্যকবিগণের ও আর্য্যশাস্ত্রের তেত্রিশ কোটি দেবতা * সেই অনন্তবিভূতিরই পরিচয় অর্জ্জুন সমক্ষে বিশ্বরূপ। আর্য্যকবিগণ এই দেবাদর্শ ধরিয়া তাঁহাদের কাব্যের এত সৌন্দর্য্যবিকাশ করিয়াছেন। আর্য্যগণের চক্ষে সেই দেবাদর্শ সমুদায় অহোরাত্র বর্ত্তমান—শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে, সেই দেবতা সমুদায় উদিত হইতেছেন। অহোরাত্র আর্য্যগণ তাঁহাদের পূজা করিতে-

---

* স্থূল ও সূক্ষ্ম দেবতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা স্থাপন করা এ স্থানে সম্ভবে না। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে, সাধারণ জনগণ যত কল্পনা দ্বারা চালিত, বুদ্ধি দ্বারা তত নহে। এ জন্য স্থূল দেবতা তাহাদের অধিকতর চিত্তরঞ্জনীয়। পুরাণের অধিকার ভক্তিপথ। ভক্তিপথে উপাসনার সৌকর্য্যার্থ মূর্ত্তিকল্পনা। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অবতার-তত্ত্ব জানিতে চাহেন, অধিক দূর যাইতে হইবে না, তাঁহারা একবার "চৈতন্যচরিতামৃত" দেখুন। কবিরাজ মহাশয় আদিতেই হিন্দুধর্ম্মের অবতার-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া পরে চৈতন্যদেবের অবতারবাদ স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুদর্শনে যুক্তির অধিকার; পৌরাণিক কাব্যে নহে।

ছেন। তাঁহাদের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে নীয়মান হইতেছেন; স্বর্গের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। সেই স্বর্গের দিকে তাকাইয়া রণবীর যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কাতর নহেন। সমুদয় কুরুবীর ও পাণ্ডববীরগণ এই স্বর্গের দিকে তাকাইয়া অনায়াসে ঘোর রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মাদ্রী, পতির অনু-গমনে অনায়াসে সহমরণ-চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন। দান-বীর বলি পাতালে গিয়াছিলেন। উশীনরাত্মজ শিবি অকাতরে নিজ গাত্রমাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন; জিতক্রোধ হইয়া ব্রাহ্মণসেবার্থ নিজ পুত্র বৃহদর্ভকে অনায়াসে বলি দিয়াছিলেন। স্বর্গে দেবতাদিগের সভা কিরূপে পরিপূর্ণ, নারদ, যুধিষ্ঠিরকে তাহার বিরাট বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র, যম, বরুণ, ব্রহ্মা ও কুবেরের ঐশ্বর্য্য সেই বিরাট বর্ণনায় জাজ্বল্যমান হইয়াছে। যিনি নিজে সুররাজ, তিনি কিরূপে স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়া-ছিলেন? মহাভারত বলিয়াছেন, অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জিতেন্দ্রিয় না হইতে পারিলে দেবত্বলাভের কোন উপায় নাই। আসুরিক রিপুপ্রাবল্য দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও সংযত হইলে তবে পুণ্যপথে স্বর্গলাভ হয়।

প্রাণপ্রতিষ্ঠিত দেবতা।

এই স্বর্গধাম আমাদের আর্য্যসাহিত্যে বিরাজিত। দেবাদর্শ সকল আর্য্যকবিগণ মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইয়াছেন। এই দেবতাগণ অমর—এ কথার অর্থ এই যে, দেবাদর্শ মানবচক্ষে জীবিতমূর্ত্তিতে

নিত্য বিরাজিত। যিনি সেই দেবাদর্শ হারাইয়াছেন, তাঁহার দেবোপাসনা হয় না; তাঁহার দেবপূজা ধর্ম্মের মৃতদেহপূজা। আদর্শ হারাইলেই আমরা দেবতার প্রাণশূন্য মৃতদেহ দেখি। যিনি দেবপ্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠিতা দেবশক্তি দেখেন, তিনিই দেবাদর্শ দেখিতে পান। যে মন্ত্রে দেবপ্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, সে মন্ত্রে দেবাদর্শ সঞ্জীবিত করিয়া দেখায়। প্রাণপ্রতিষ্ঠা না হইলে দেবতার পূজা নাই। প্রাণপ্রতিষ্ঠা কি? ধ্যানে দেবতার জীবিতা শক্তিময়ী মূর্ত্তি অনুভব করা। এই জীবিত মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া হিন্দু দেবোপাসনা করেন।

দেবচরিত্র।

প্রাণপ্রতিষ্ঠিত করিয়া আর্য্যোপাসক দেবপ্রতিমায় অনন্ত দেবকে দেখেন। দেবতাসকল অনন্ত দেবের অগণ্য বিভূতির পরিচায়ক-রূপে অন্তরে উদিত হন। আর্য্যকবিগণ এই দেবমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্যে আর্য্যসাহিত্য পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। দেবপ্রেম, দেব-শাসন, দেববল, দেববিভূতি আর্য্যসাহিত্যে অসংখ্যমূর্ত্তিতে দেদীপ্যমান। সকল মূর্ত্তিই সেই সগুণ ঈশ্বরের প্রেমমূর্ত্তি। প্রেমমূর্ত্তি কখন ভীম প্রচণ্ড রূপে উদিত হইয়া অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিতেছেন, কখন অতি মোহন বেশে শ্যাম-সুন্দর রূপে গোপীগণের এবং ভক্তমণ্ডলীর প্রেমপিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছেন, এবং কখন অন্নপূর্ণা রূপে পুরুষরূপী বিশ্বাত্মাকে অন্ন ও প্রেম বিতরণ করিতেছেন। এই দেবতাসকল অনন্তদেবের বিভূতির অংশাবতার। পূর্ণ বিভূতিতে তিনি রাম ও কৃষ্ণরূপে আর্য্যসাহিত্যে প্রকাশিত।

আর্য্যসাহিত্য ব্যতীত আর কোন্ জাতির কাব্যের কার্য্যক্ষেত্রে ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন? ইউরোপীয় কোন্ কাব্যে রাম ও কৃষ্ণচরিত্রের ন্যায় প্রকাণ্ড ভগবৎ-চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে? কাব্যের কার্য্যক্ষেত্রে বরাবর ভগবচ্চিত্র মানবের হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছে?—হৃদয়াকর্ষণ করিয়াছে, ভগবানের অলৌকিক ব্যাপারে। মানব মনে একদা ভয় ও গাম্ভীর্য্যরসের সঞ্চার করিয়াছে?—যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অলৌকিক শক্তি ধারণ করিয়া ভগবান মূর্ত্তিমান হইয়া কার্য্য করিতেছেন। ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যক্ষেত্রে তিনি বিশ্বপ্রেমে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতসাধনে কত অলৌকিক ব্যাপার উৎপাদন করিতেছেন! পাপীকে যথোচিত দণ্ডবিধান করিয়া পৃথিবীর পাপস্রোত নিবারণ করিতেছেন। পুণ্যবানগণ তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন। এ সমস্ত কল্পনা মানস-চক্ষে পাঠক দর্শন করেন। দর্শন করিয়া কাব্যজগতে পরলোক প্রত্যক্ষ করেন। ভগবানের জগৎশাসন ও পালন বিলক্ষণ অনুভূত হয়। কাব্যসৃষ্টির যথার্থ ফলোদয় হয়। সেই কার্য্যব্যাপারসমূহ কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। মানব ভগবানের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া থাকেন। দেবত্বের এই ভগবৎরসে আর্য্যগণের মহাকাব্যাবলি পরিপূরিত। এ রস ইউরোপীয় সাহিত্যে নাই। মিল্টন, ভার্জিল, দান্তে ও হোমর কাব্যক্ষেত্রে ভগবানকে অবতীর্ণ করিয়া ধরিত্রীর বাস্তবিক কার্য্যক্ষেত্রে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাদের কাব্য-পাঠে দেবশক্তির সম্যক অনুভব হয় না। হইবে কি? ভগবানের সমস্ত বিভূতিজ্ঞান তাহাদের নাই। বেদে ব্রহ্মজ্ঞান যত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, ইউরোপ, কি অপরাপর কোন দেশে

সেই পূর্ণাবয়বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রচারিত নাই। এই বৈদিক জ্ঞানের সামান্য অংশ যাহা অপরাপর দেশে নানাসূত্রে গিয়াছে, তাহা যথেষ্ট নহে। তাহাতে কবির সৃষ্টি সম্ভূত হয় না। কাব্যসৃষ্টির জন্য যে বহু আয়োজন ও সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা কেবল বেদ বেদান্ত দিতে পারিয়াছে। সেই বেদে দেবতাগণের বিরাট রাজ্য; স্বর্গের সুবর্ণকান্তি উজ্জ্বল বিভায় প্রভাসিত। বেদান্তে দেবতা ও স্বর্গ তিরোহিত; তথায় ব্রহ্মের নির্ম্মল ও পবিত্র চৈতন্যমূর্ত্তি প্রকাশিত। কারণ, বেদে ক্রিয়াকাণ্ডের অধিকার,—স্বর্গ যাহার ফল; বেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার,—মুক্তি যাহার পরিণাম। *

ঋষিচরিত্র।

আর্য্যসাহিত্যে যে দেবাদর্শ বিদ্যমান, সেই দেবত্বে কি মানব উঠিতে পারে? খ্রীষ্ট ইউরোপ বলিয়াছে পারে না, বৈদিক আর্য্যগণ বলিয়াছেন, পারে। আর্য্যঋষি বলেন, মানবেই দেবতা আবরিত আছেন, সেই আবরণ বিমুক্ত হইলেই দেবতার বিকাশ হয়। মানব-দেহেই পরমেশ্বর আত্মরূপে বিদ্যমান; সেই আত্মার মোহাবরণ ঘুচিলেই তাঁহার দিব্যজ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়। মানব যে দেবত্বে উঠিতে পারেন, তাহার প্রমাণ আর্য্যঋষিগণ দিয়া গিয়াছেন। ঋষিগণ তপস্যা-বলে অসাধ্যসাধন করিয়া গিয়াছেন।

---

* বেদব্যাস অধিকার অনুসারে বেদ বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান বেদ মধ্যে খোঁজেন; তাঁহারা কাজেই বিফল হন। যে ঘরে যাহা রাখা হইয়াছে, সেই ঘরেই তাহা পাওয়া যায়; অন্য ঘরে নহে।

সামান্য মানব হইতেই দৈবশক্তি কেমন প্রাদুর্ভূত হইতে পারে, তাহা তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই আর্য্যসাহিত্যে ঋষি-চরিত্রের সমাবেশ। এই ঋষিচরিত্রে প্রকাশিত, দেবত্বলাভ করা মানবের সাধ্যাতীত নহে। অগণ্য ঋষিচরিত্রে আমাদের মহা-কাব্যদ্বয় পরিপূর্ণ। মানবের দেবশক্তিলাভের তাঁহারা অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

মানবচরিত্র।

আর্য্যসাহিত্যে যে শুধু দেবতা ও ঋষি আছেন, এমত নহে; তাহা সাধক ও ভক্ত চরিত্রেও পরিপূর্ণ। একদিকে দেবচরিত্রের সুমহান্ উচ্চ আদর্শ, অন্যদিকে ঋষিচরিত্রের তপস্যা-বলের প্রভাব সেই আদর্শের সিদ্ধতা প্রতিপাদন করিতেছে। আর এক স্থানে দেখ, মানুষ সেই তপস্যায় প্রবৃত্ত। রিপুকুলকে বশীভূত করিয়া মহা সংযমবল লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার তপস্যা। এই তপস্যাবলে ধ্রুব দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তপস্যাবলে ভক্ত প্রহ্লাদ জগতের চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। যযাতি যেই স্বর্গে যাইতেছেন, এমত সময় দেবগণ দেখিলেন, তিনি এখনও দেবত্ব লাভ করেন নাই, তাহার আত্মগরিমা ও অহমিকা এখনও প্রবল; অমনি যযাতিকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে হইল। আবার তপস্যা করিয়া অহ-ঙ্কার পরিত্যাগের নিমিত্ত তিনি মর্ত্ত্যে আসিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির এত সাধনা করিয়া, ভীষ্মের পাদমূলে বসিয়া এত বেদগর্ভ মহার্ঘ উপদেশ লাভ করিয়াও যখন এই অহঙ্কারবশতঃ বনবাসে যাইতে চাহিলেন, যখন তিনি চাহিলেন, আমাকে রাজ্যানুরক্ত করিয়া রাখিতে সকলে অনুরোধ করুক, তখন অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহার সেই অহঙ্কার রোগ দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া তাহার পরিহারার্থ যুধিষ্ঠিরকে যথোচিত ভৎসনা করিলেন। বাস্তবিক, সমগ্র মহাভারতে এই যুধিষ্ঠিরের মহান্ চরিত্রে ধর্ম্মের উগ্র তপস্যা। যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ ও ঋষিসমাজে পরিবৃত হইয়া নানা উপদেশ-বাক্যে আপনাকে শুদ্ধপ্রকৃতি করিবার জন্য বরাবর চেষ্টা করিতেছেন। তপস্যা-প্রভাবে ধর্ম্মব্যাধ কেমন দেবত্বলাভ করিতে-ছেন, মহাভারতে তাহা প্রতীয়মান। ধর্ম্মব্যাধ গৃহধামে নিজ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দেবতাস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভক্তি ও প্রেমব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। নবীন তপস্বী কৌশিককে তিনি সেই পিতৃভক্তির দেবাদর্শ দেখাইয়াছিলেন। দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার বৃদ্ধ জনক জননী কেমন প্রেম ও ভক্তির স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া দেবপূজায় দেবোপম হইয়াছেন! কৌশিক তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অমূল্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ জনক জননীর পূজার্থ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সতী ব্রাহ্মণী তাঁহাকে এই ব্রত শিক্ষা দিবার জন্য ধর্ম্মব্যাধের গৃহে তাঁহাকে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। ব্রাহ্মণী নিজে একমনে সতীত্বব্রতের তপস্যায় প্রবৃত্ত ছিলেন। কুন্তী, গান্ধারী সবাই ধৃতব্রতা তপস্বিনী।

আর্য্যসাহিত্যে যে মানবচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা সামান্য মানব-চরিত্র নহে, তাহা তপস্যাব্রতধারী, দেবত্বলাভের জন্য প্রয়াসী মানবের চরিত্র। তাহা পরিস্ফুটরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য, তৎপার্শ্বে রাক্ষস, দৈত্য ও দানবচরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই পাপচরিত্রও মনুষ্যচরিত্র, কিন্তু তাহা রিপুপ্রবল, মানুষচরিত্র ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত মানব সংযম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রিপুর দাস ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পাপাচারে কেমন পৃথিবীকে ভারগ্রস্ত

করেন, তাহা এই দানবচরিত্রে প্রকাশিত। দেব, ঋষি, মনুষ্য ও দানব—এই চতুর্ব্বিধ চরিত্র লইয়া আর্য্যসাহিত্য প্রস্তুত হইয়াছে।

যে মানবচরিত্র আর্য্যসাহিত্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই যথার্থ মনুষ্যোচিত; তাহা রিপুপ্রবল নরাকার পাশব মনুষ্যচরিত্র হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তাহাতে দেবত্ব ক্রমে বিকাশ হইতেছে; ইন্দ্রিয়-সংযম এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধন করিয়া মনুষ্য দেবতাদের বিশ্বপ্রেমে উঠিতেছেন। দেবতারাও সংসারী—তাঁহাদের পুত্র কলত্রাদি সকলই আছে। কিন্তু তাঁহারা সংসারী হইয়াও বিশ্বরক্ষা ও প্রতিপালন কার্য্যে ব্যাপৃত। এই কার্য্যের নিমিত্তই তাঁহাদের পুত্র কলত্র। তাঁহাদের বিশ্ববিসারী প্রেমের ছবি আর্য্যসাহিত্যে অঙ্কিত। সেই আদর্শে মনুষ্যচরিত্র গঠিত। সুতরাং দেবত্বে উঠিবার নাম প্রেম প্রসারণ করা। এই প্রেম-প্রসারণ করা বড়ই কঠিন তপস্যা—তাহাতে একনিষ্ঠ থাকাই তপস্যা। সেই তপস্যাপ্রভাবে প্রেম ভক্তির আশ্রয়ে প্রথমে জীবিত গুরুজনে, শুধু জীবিত গুরুজনে নয়, শ্রাদ্ধাদি তর্পণরূপে মৃত গুরুজনেও বিস্তৃত, গুরুজন হইতে ভগবানে বিন্যস্ত এবং ভগবানে একান্ত সমর্পিত হইলে সর্ব্বজীবে ও সমস্ত জগতে তাহা ব্যাপ্ত হয়। কারণ, আর্য্যধর্ম্মে ভগবান সর্ব্বব্যাপী—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপে তিনি বর্ত্তমান। সেই বিশ্বরূপে ভগবান জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ হইলে, প্রণত আর্য্য এই বলিয়া গাহিয়া উঠেন :—

> "পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
> সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
> ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
> মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥”

সম্পূর্ণ।